তিন গোয়েন্দা

রক্তচক্ষু

রকিব হাসান

Facebook.com/LoveTinGoyenda

রক্তচক্ষু

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে আরেকটি ব্যস্ত দিন। ট্রাক থেকে মাল নামাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ছোট অফিসের বাইরে একটা লোহার চেয়ারে বসে তাদের কাজ দেখছে মেরিচাচী।

'কিশোর,' ডেকে বললেন তিনি, 'মূর্তিগুলো ওই টেবিলটায় রাখিস। দেখিস, ভাঙে না যেন। ভালই কাটতি হবে ওগুলোর, মনে হচ্ছে।'

একসঙ্গে অনেক পুরানো মাল নিলামে কিনেছেন রাশেদ পাশা, এক ট্রাক রেখে গেছেন, আরও আনতে গেছেন বোরিস আর রোভারকে নিয়ে।

পুরু করে ক্যানভাস বিছিয়ে তার ওপর যত্ন করে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে মূর্তিগুলো। আবক্ষ মূর্তি, শুধু বুক থেকে ওপরের অংশটুকু।

ট্রাকে উঠে মূর্তিগুলো দেখছে তিন গোয়েন্দা। অবাক হয়ে ভাবছে, এগুলো কার দরকার? কে কিনতে আসবে? নিয়ে গিয়ে করবেটা কী? মোটা তেরোটা মূর্তি, বহুদিন অযত্ন অবহেলায় পড়ে থেকে রঙ চটে গেছে, ধুলো জমেছে পুরু হয়ে।

চারকোনা বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিগুলো, প্রতিটির আলাদা আলাদা নাম খোদাই করা রয়েছে: 'জুলিয়াস সিজার, অকটেভিয়ান, দান্তে, হোমার, ফ্র্যানসিস বেকন, শেকসপিয়ার,' জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'সব দেখছি বিখ্যাত লোক।'

'অগাসটাস অভ পোল্যান্ড,' রবিন পড়ল। 'অচেনা। কখনও শুনিনি।'

'লুথর,' বিসমার্ক, আঙুল তুলে দুটো মূর্তি দেখাল মুসা। 'এসব নামও শুনিনি।'

'কিন্তু থিওডর রুজভেল্ট-এর নাম তো শুনেছ,' কিশোর বলল। 'কিংবা ওয়াশিংটন, ফ্র্যাংকলিন আর লিংকন?'

'নিশ্চয়,' মুসা বলল। 'এসো, ওয়াশিংটনকে দিয়েই শুরু করি।' নিচু হয়ে জর্জ ওয়াশিংটনকে তুলে নিল। 'আউফ! কী ভারি।'

'মুসা, সাবধান!' ডেকে বললেন মেরিচাচী। 'পায়ের ওপর ফেলো না, দেখো!'

'আমি নীচে নামছি, তারপর দিও,' লাফিয়ে ট্রাক থেকে নামল কিশোর।

দু'হাতে মূর্তিটা জাপটে ধরে হাঁটু গেড়ে বসল মুসা। সাবধানে নামিয়ে দিল কিশোরের ছড়ানো বাহুতে। টলে উঠল কিশোর, বাঁকা হয়ে গেল পেছন দিকে। কোনমতে বয়ে এনে টেবিলে ফেলল আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্টকে। কপালের ঘাম মুছল।

'চাচী,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর, 'আমরা পারব না। একটা ফেলে দিলে যাবে পঞ্চাশ ডলার। তার চেয়ে বোরিস আর রোভার আসুক।'

'ঠিক,' মাথা ঝোঁকালেন মেরিচাচী, 'থাক। আসুক ওরা। তোরা জিরিয়ে

নে-গে, যা।'

বেশিক্ষণ জিরাতে পারল না তিন গোয়েন্দা, গেট দিয়ে আরেকটা বড় ট্রাক ঢুকল। গাড়ি চালাচ্ছে রোভার, পাশে বসে আছেন রাশেদ পাশা। ছোটখাট মানুষ, প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর ইয়া বড় গোঁফ। ট্রাকের পেছনে মালের বোঝার ওপর আরাম করে বসে আছে বোরিস।

প্রথম ট্রাকটার কাছে এনে দ্বিতীয়টাকে রাখল রোভার। তাড়াহুড়ো করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। ট্রাকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে রয়েছে অনেকগুলো পুতুল, দরজিরা পোশাক তৈরি করতে যে ডামি ব্যবহার করে, ওই জিনিস। স্বাভাবিক উচ্চতার মেয়েমানুষের সমান ডামিগুলো ধাতু দিয়ে তৈরি, গলার ওপরে আর কিছু নেই, এক কোপে মুণ্ড ফেলে দেয়া হয়েছে যেন, পা-ও নেই, দাঁড়িয়ে আছে একটা ধাতব দণ্ডের ওপর। পুরানো আমলের জিনিস, এগুলো আজকাল আর বিশেষ ব্যবহার হয় না।

বোকা হয়ে মূর্তিগুলোর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মেরিচাচী। চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ, 'আরে! এগুলো কী এনেছ! মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? এক ট্রাক পুরানো ডামি! হায় হায় হায় হায়! সব পয়সা পানিতে ফেলে এসেছে!'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?' শান্ত কণ্ঠে বললেন রাশেদ পাশা। কম পয়সায় পেলে যে কোন বাতিল মাল কিনতে তিনি আগ্রহী। জানেন, কোনটাই পড়ে থাকে না ইয়ার্ডে। বিক্রি হয়ে যায়ই। কিশোরের দিকে ফিরলেন। 'তোর কী মনে হয়?'

'আমার তো ধারণা বিক্রি হয়ে যাবে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। 'আরচারি ক্লাবের ওরাই এসে কিনে নিয়ে যাবে, তীর ছোঁড়া প্র্যাকটিস করার জন্যে।'

'হুঁমম্!' ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন রাশেদ চাচা। 'নিতে পারে। ভাবো, আরও ভেবে দেখো। কাদের কাছে বিক্রি করা যাবে, ভেবে বের করো। তোমার কথা ঠিক হলে ফাইভ পারসেন্ট কমিশন তোমার।...তা, হ্যাঁরে, মূর্তিগুলোর ব্যাপারে কী মনে হয়? খুব ভাল জিনিস কিনেছি, না?'

'প্রথমে বুঝিনি ওগুলো দিয়ে কী হবে,' জবাবটা দিলেন মেরিচাচী। 'অনেক ভেবে একটা বুদ্ধি বের করেছি। বিজ্ঞাপন দেব। বাগানে সাজাতে পারবে লোকে। ফুলের ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মন্দ লাগবে না।'

'খামোকাই তো রেগে যাও,' সুযোগ পেয়ে গলার জোর বাড়ল রাশেদ চাচার, 'আসলে, সব জিনিসই কাজে লাগে।'

'তাই বলে ও ডামিগুলো কোন কাজে লাগবে না!'

লাগবে, লাগবে। কিশোর ঠিক একটা উপায় বের করে ফেলবে, দেখো। এই, রোভার, বোরিস, মূর্তিগুলো নামিয়ে ফেলো। দেখো, ভাঙে-টাঙে না যেন। চলটা উঠলেও আর কেউ কিনতে চাইবে না। সাবধানে নামাও।'

ছায়ায় গিয়ে বসলেন রাশেদ পাশা, পাইপ বের করে ধরালেন। দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের ওপর চোখ। দুজনেই বিশালদেহী, গায়ে ভীষণ জোর। ভারি মূর্তিগুলোকে এমনভাবে নামাচ্ছে, যেন ওগুলো তুলার পুতুল।

'পাহাড়ের মাথায় বিরাট এক পুরানো বাড়িতে ছিল মূর্তিগুলো,' বললেন রাশেদ চাচা। 'বাড়ি না ওটা, আস্ত এক দুর্গ। মালিক নেই, মারা গেছে। পুরানো জিনিসপত্র সব বেচে দিয়েছে, আমি যাওয়ার আগেই সব সাফ। মূর্তিগুলো অকাজের ভেবে কেউ নেয়নি। আর কিছু বই। একটা পুরানো সূর্যঘড়ি আর গোটা কয়েক চেয়ার পেয়েছি, বাগানে বসার চেয়ার। কিনে ফেললাম।'

মেরিচাচীর সঙ্গে কথা বলছেন চাচা। এই-ই সুযোগ, চুপচাপ ওখান থেকে সরে চলে এল তিন গোয়েন্দা, নিজেদের ওয়ার্কশপে এসে ঢুকল।

সামনে লম্বা ছুটি, কী করে কাটাবে, সেই আলোচনায় বসল ওরা।

'কী করি?' মুসা বলল। 'চলো, মরুভূমিতে চলে যাই একদিন। পুরানো পোড়ো শহর দেখব।'

'তার চেয়ে সাবান কোম্পানির প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাক,' প্রস্তাব রাখল রবিন। 'জিততে পারলে হাওয়াই থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।'

'আমি, ভাবছি...,' কথা শেষ করতে পারল না কিশোর, তার আগেই মাথার ওপরের লাল আলোটা জ্বলতে-নিভতে শুরু করল।

'ফোন এসেছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'নিশ্চয় কেউ কোন সমস্যায় পড়েছে,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের চেহারা।

দুই সুড়ঙ্গের পাইপের মুখের ঢাকনা সরিয়ে ফেলেছে মুসা ইতিমধ্যে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল তার ভেতর। মোটা একটা গ্যালভানাইজড পাইপকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জঞ্জালে ঢাকা একটা মোবাইল ট্রেলারের তলায়। ট্রেলারের ভেতরে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার।

পাইপের শেষ মাথায় আরেকটা ঢাকনা সরিয়ে ট্রেলারের ভেতর ঢুকল মুসা। তার পেছনে অন্য দুজন।

থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। 'হাল্লো! কিশোর পাশা।' টেলিফোন লাইনের সঙ্গে যুক্ত, স্পীকারের সুইচ অন করে দিল।

'ধরে থাকো, প্লীজ,' ভেসে এল একটা নারীকণ্ঠ। 'মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার কথা বলবেন।'

মিস্টার ক্রিস্টোফার! তারমানে আরেকটা রহস্যময় কেস!

'কিশোর,' গমগম করে উঠল চিত্র পরিচালকের ভারি কণ্ঠ, 'ব্যস্ত? আমার সামনে একজন বসে আছে। তোমাদের সাহায্য চায়। করতে পারবে?'

'নিশ্চয়, সর। সানন্দে। কী সাহায্য চায়?'

'কেউ একজন মূল্যবান কিছু রেখে গেছে তার জন্যে। কী জিনিস, কোথায় আছে, কিছুই জানে না সে। যদি কাল দশটায় আমার অফিসে আসো, ও থাকবে ওখানে।'

দুই

'দারুণ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'নতুন কেস! সময় কাটবে এবার!'

'মূল্যবান জিনিস রেখে গেছে!' ভ্রূকুটি করল রবিন। 'কী জিনিস জানে না! কোথায় আছে, তা-ও না! জটিল ব্যাপারই মনে হচ্ছে!'

'জটিল হলেই তো ভাল,' কিশোর বলল। 'কাজ করে মজা পাওয়া যাবে।'

'একটা গাড়ি পেলে ভাল হত,' আফসোস করল মুসা। 'এত বড় স্টুডিওতে ওই পুরানো পিকআপ নিয়ে যেতে খারাপ লাগে, ফকির ফকির মনে হয়।'

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল, 'রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানিতে ফোন করছি। রোলস রয়েসটা নিয়ে কাল সকালে হাজির হয়ে যাবে হ্যানসন।' ডায়াল শুরু করল সে।

এক সময় বিজ্ঞাপনের বাজি জিতে সোফারসহ একটা গাড়ি তিরিশ দিন ব্যবহারের জন্যে পেয়েছিল কিশোর। বিশাল এক রোলস রয়েস, পুরানো ধাঁচের রাজকীয় গাড়ি, ক্লাসিক্যাল চেহারা। চৌকো, বাক্সের মত দেখতে মূল শরীরটা কুচকুচে কালো। চকচকে পালিশ, মুখ দেখা যায়। মাঝে মাঝে সোনালি রঙের কাজ। প্রকাণ্ড দুটো হেডলাইট।

'হাল্লো!' বলল কিশোর। 'ম্যানেজার সাহেব আছেন? প্লীজ, দিন।...ম্যানেজার সাহেব? আমি কিশোর পাশা। আগামীকাল সকাল সাড়ে ন'টায় রোলস রয়েসটা দরকার, হ্যাঁ হ্যাঁ, শোফারসহ।'

'অসম্ভব!' কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল বিস্মিত হয়েছে ম্যানেজার। 'তোমার তিরিশ দিন সেই কবেই শেষ হয়ে গেছে।'

'ঠিক বলেছে,' মুসা বলল। 'আরও কত তিরিশ দিন পেরিয়ে গেছে। দেবে কেন?'

মুসার কথায় কানই দিল না কিশোর। 'ম্যানেজার সাহেব, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আমার হিসেবে তিরিশ দিন পেরোতে এখনও অনেক দেরি।'

'কী বলছ!' মুসা অবাক। 'ভুল তো তুমিই করেছ!'

মুসার দিকে চেয়ে হাত নাড়ল কিশোর, চুপ করার নির্দেশ।

'তুমি ভুল করছ, খোকা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ম্যানেজার।

'ম্যানেজার সাহেব,' কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব ফোটাল কিশোর, 'শিগগিরই অন্য কথা বলবেন। আমি বিশ মিনিটের মধ্যে আসছি, সামনা-সামনি আলোচনা হবে।'

'আলোচনার কিচ্ছু নেই!' রুক্ষ হয়ে উঠল ম্যানেজারের কণ্ঠ। 'আসতে চাইলে এসো, কিন্তু কোন লাভ হবে না।'

'থ্যাংক্যু,' বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে সঙ্গীদের দিকে ফিরল কিশোর। 'চলো। শহরতলীতে যাব।'

'কিন্তু ম্যানেজার ঠিকই বলেছে!' প্রতিবাদ করল মুসা। 'তিরিশ দিন সেই কবে শেষ...'

'সব সময় তিরিশ দিন পেরোলেই তিরিশ দিন হয় না,' রহস্যময় শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনার দিকে এগোল সে।

'কিন্তু...'

'খামোকা তর্ক করছ, মুসা,' রবিন বাধা দিল। 'ও যা ভাল বুঝছে, করুক না।

যদি গাড়িটা আবার পাই আমরা, ক্ষতি কী?'

সাইকেল নিয়ে ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সৈকতের ধার ঘেঁষে চলে গেছে পথ, ঢুকেছে গিয়ে রকি বীচের একেবারে অভ্যন্তরে। বাঁয়ে উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে গাঢ় নীল প্রশান্ত মহাসাগর। দিগন্তের কাছে অনেকগুলো বিন্দু, সব মাছধরা নৌকা। ডানে আকাশ ফুঁড়ে উঠে যাওয়ার তাল করছে যেন সান্তা মনিকা পর্বতমালা, রুক্ষ, বাদামী।

প্রধান সড়কের এক মোড়ে রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানির বিশাল অফিস। সাইকেল স্ট্যান্ডে তুলে রেখে ভিতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা, আগে আগে হাঁটছে কিশোর, দ্বিধাজড়িত পায়ে তাকে অনুসরণ করছে মুসা আর রবিন। ওরা ঠিক জানে, বিফল হয়ে ফিরতে হবে।

অফিসেই রয়েছে ম্যানেজার। লাল চেহারা, কড়া মানুষ, সেটা চেহারাতেই স্পষ্ট। তিন গোয়েন্দাকে দেখে ভারি ভুরু কোঁচকাল। গম্ভীর।

'তিরিশ দিন গাড়ির ব্যবহারের কথা ছিল,' কোনরকম ভূমিকা করল না ম্যানেজার, 'করেছ। আবার কী চাই? গুণতে জানো না?'

'জানি, স্যর,' নরম হয়ে বলল কিশোর। 'আর খুব নিখুঁতভাবে গোণার চেষ্টা করি।' পকেট থেকে নোটবুক বের করে তার ভেতর থেকে বের করল একটা খাম। খাম থেকে ছোট একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজের টুকরো বের করে মেলল। জোরে জোরে পড়ল, 'রাজকীয় রোলস রয়েস ব্যবহারের সুবর্ণ সুযোগ! সোফারসহ অন্যান্য সব খরচ-খরচা কোম্পানির। তিরিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা করে ব্যবহার করা যাবে গাড়িটা, যদি ছোট্ট একটা কাজ করতে পারেন। জারে ক'টা সীমের বীচি আছে আন্দাজ করে বলতে হবে। রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানি।'

ভুরু নাচাল ম্যানেজার। 'ঠিকই তো আছে। কথার বরখেলাপ করেছি আমরা? তিরিশ দিনের জন্যে গাড়িটা দেয়া হয়েছে তোমাকে, যখন ডেকেছ, পেয়েছ। দিনে-রাতে যখন খুশি।'

'লেখাটা আরেকবার ভাল করে দেখলে ভাল হত না, স্যর?' অনুরোধ করল কিশোর। 'লেখা হয়েছে, তিরিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা করে ব্যবহার করা যাবে।'

'গোলমালটা কোথায় দেখলে?' রেগে যাচ্ছে ম্যানেজার। 'চব্বিশ ঘণ্টায় দিন, এটা তো সবাই জানে।'

'ঠিক বলেছেন,' সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরল কিশোর। 'যেটা সবাই জানে, সেটা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলার দরকার কী? উল্লেখ করার কোন দরকার ছিল? বললেই চলত, তিরিশ দিনের জন্যে গাড়িটা পাওয়া যাবে।'

'ইয়ে...মানে...,' তোতলাতে শুরু করল ম্যানেজার, একটু যেন ঘাবড়ে গেছে। 'মানে, আমি পরিষ্কার করে সব বলতে চেয়েছিলাম।'

'তা চেয়েছেন,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিন্তু আমার কাছে অন্যরকম লাগছে। আমি ধরে নিচ্ছি চব্বিশ ঘণ্টা করে তিরিশ দিন, তার মানে তিরিশ গুণন চব্বিশ। এখন আমার হিসেবে,' আবার নোটবই খুলল সে, 'আমি গাড়িটা ব্যবহার করেছি মোট সাতাত্তর ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট, মানে তিন দিনের কিছু বেশি। তা হলে,

আরও প্রায় সাতাশ দিন থেকে যাচ্ছে।'

হাঁ হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। কিশোরের কথা উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। অযৌক্তিক কিছু বলছে না সে।

কথা হারিয়ে ফেলেছে ম্যানেজার। রাগে লাল চেহারা আরও লাল হয়ে উঠেছে।

'অসম্ভব!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ও-রকম কিচ্ছু বলিনি আমি! ওটা একটা কথা হলো নাকি?'

'সে জন্যেই তো, স্যর,' শান্ত রয়েছে কিশোর, 'যা বোঝানো দরকার ঠিক তাই বলা উচিত। কথা বড় খারাপ জিনিস, একটু এদিক ওদিক হলেই...। এই যে, দেখুন না, এখানে আপনি বোঝাতে চেয়েছেন...'

'না, আমি চাইনি!' গর্জে উঠল ম্যানেজার। 'আমার সবচেয়ে ভাল গাড়িটা তোমাকে সারাজীবনের জন্যে দিয়ে দেব ভাবছ! বিজ্ঞাপনে কী লেখা আছে না আছে, কেয়ার করিনি আমি। তিরিশ দিন বলেছি, তিরিশ দিনের জন্যে দিয়েছি। সময়সীমা শেষ। যাও।'

'কিন্তু আমরা তো ছিলামই না রকি বীচে,' প্রতিবাদ করল এবার রবিন। 'তিরিশ দিন কী করে ব্যবহার করলাম? কোনরকম ফাঁক না দিয়ে তিরিশ দিন ব্যবহার করতে হবে, এটাও তো লেখেননি। এ-ও তো ধরে নিতে পারি, বছরে একদিন করে আগামী তিরিশ বছর পাব আমরা গাড়িটা। নাকি।'

এই নতুন আঘাতে থতমত খেয়ে গেল ম্যানেজার। 'না...তা...!' মাথা কাত করল সে। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আর দু'বার গাড়িটা পাবে তোমরা। তবে কথা দিতে হবে, এরপর আর কখনও জ্বালাতে আসবে না। দু'বার, ঠিক আছে?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। খুব নিরাশ হয়েছে যেন। 'ঠিক আছে, কী আর করা? আপনাদের গাড়ি, জোর করে তো আর নিতে পারব না। রাজি, দু'বারেই রাজি। রবিন, চলো যাই।' ম্যানেজারের দিকে ফিরল আবার সে। 'কাল সকাল সাড়ে ন'টায় চাই একবার। পাওয়া যাবে?'

'যাবে। যাও।'

চুপচাপ বেরিয়ে হোঁস্‌স্‌ করে শ্বাস ফেলল মুসা। 'রাজি হলে কেন? ব্যাটা আটকে গিয়েছিল, চাপ দিলেই কাজ হয়ে যেত।'

'না-ও হতে পারত,' কিশোর বলল। 'হয়তো কোর্টে নালিশ করতে বলত আমাদেরকে। বিচারে ঠকে যেতাম আমরা। তিরিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা করে ওই তিরিশ দিনকেই বোঝায়।'

'কিন্তু মাত্র দু'বার ব্যবহার করলেই বা কী, আর না করলেই বা কী?'

'তাই বা কম কীসে? গাড়িটা তো আর আমাদের সম্পত্তি না।' সুর করে বলে উঠল কিশোর, 'সামনে যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক।' চরণদুটো ইংরেজিতে আবার অনুবাদ করে বলল সে।

'তারমানে যা পেলাম, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলছ?' মুসা বলল।

'হ্যাঁ। কে জানে, নতুন কোন উপায় বেরিয়েও যেতে পারে। হয়তো আরও অনেক দিন অনেক বার গাড়িটা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েও যেতে পারি আমরা। আগামীকাল মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, প্যাসিফিক স্টুডিওতে পুরানো পিকআপ নিয়ে যেতে হচ্ছে না, এতেই খুশি আমি। ভাবছি, কী রহস্য ওখানে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে!'

তিন

'এসো, এসো,' তিন গোয়েন্দাকে দেখেই ডাকলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'পরিচয় করিয়ে দিই।' বিশাল টেবিলের ধারে চেয়ারে বসা এক কিশোরকে দেখালেন তিনি। 'ও অগাস্ট অগাস্ট, ব্রিটিশ। অগাস্ট, এই আমাদের তিন গোয়েন্দা। ও কিশোর পাশা, বাড়ি বাংলাদেশ। ও মুসা আমান, আদিবাস ছিল আফ্রিকায়, এখন আমেরিকার নাগরিক। আর এ হলো রবিন মিলফোর্ড, এ-ও খাঁটি আমেরিকান নয়, আইরিশ রক্ত রয়েছে, তারমানে তোমার আর আমার বাড়ির কাছের লোক।'

এক এক করে চেয়ার টেনে বসল তিন গোয়েন্দা। উঠে এসে হাত বাড়িয়ে দিল ইংরেজ কিশোর। লম্বা তাল পাতার সেপাই, পাতলা চুল খুব লম্বা করে রেখেছে। চোখা উঁচু নাকের ঠিক মাঝখানে বসে আছে হর্নরিমড গ্লাসের চশমা। 'তোমাদেরকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।' একে একে হাত মেলাল তার সমবয়েসী তিন কিশোরের সঙ্গে। 'বন্ধুরা আমাকে গাস বলে ডাকে, অগাস্টের সংক্ষেপ আরকী, তোমরাও তাই ডাকবে।'

আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল অগাস্ট। 'আশা করছি, তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমার দাদার ভাই, মানে আমার আরেক দাদা, হোরাশিও অগাস্ট, এই কিছুদিন আগে মারা গেছে। তার উকিল আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে, চিঠিটার মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'আমিও না,' মাথা নাড়লেন চিত্র পরিচালক। 'অথচ হোরাশিও অগাস্টের ধারণা, তাঁর নাতি সেটা বুঝতে পারবে। অগাস্ট, ওদেরকে দেখাও চিঠিটা।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে সেটা থেকে একটা কাগজ নিয়ে সাবধানে ভাঁজ খুলল অগাস্ট। কাঁপা হাতের লেখা রয়েছে তাতে। 'নাও,' কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে চিঠিটা। 'দেখো, কিছু বুঝতে পারো কিনা।'

দু'পাশ থেকে রবিন আর মুসাও ঝুঁকে এল চিঠিটার ওপর।

'লেখা রয়েছে:

'আমার নাতি, অগাস্ট অগাস্ট,

'অগাস্ট তোমার নাম, অগাস্ট তোমার খ্যাতি, অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য। পাহাড়-প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করবে না; তোমার জন্ম তারিখের ছায়াতেই ওর অস্তিত্ব।

'গভীরে খোঁড়ো; আমার কথার অর্থ শুধু তোমার জন্যেই। স্পষ্ট করে বলতে পারছি না, তা হলে অন্যেরা বুঝে ফেলবে। ওটা আমার, ওটার জন্যে মূল্য দিয়েছি, ওটার মালিক হয়েছি, অথচ ওটার ভয়ে অস্থির আমি।

'তবে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে, অর্ধশতাব্দী পর নিশ্চয় ওটার পঙ্কিল ক্ষমতা দূর হয়েছে। কিন্তু তবু ওটাকে জোর করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দখল করার উপায় নেই; ওটা হয় কিনতে হবে, কিংবা কারও কাছ থেকে উপহার পেতে হবে, কিংবা খুঁজে বের করতে হবে।

'সাবধান থেকো। সময় খুব মূল্যবান। ওটা আর আমার সব ভালবাসা তোমাকে দিয়ে গেলাম।—হোরাশিও অগাস্ট।'

'বাবারে বাবা!' ঠোঁট ওল্টাল রবিন। 'চিঠি বটে!'

'ইংরেজি না তো, গ্রীক!' বিড়বিড় করল মুসা। 'পঙ্কিল ক্ষমতা মানে কী?'

'হতে পারে, খারাপ কোন ক্ষমতা,' রবিন বলল। 'হয়তো ক্ষতি করার ক্ষমতা বা ওই জাতীয় কিছু বোঝানো হয়েছে।'

চুপচাপ চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে আছে কিশোর, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে, তারমানে গভীর ভাবনা চলছে তার মাথায়। আস্তে করে কাগজটা আলোর দিকে তুলে ধরল, লুকানো সাংকেতিক লেখা আছে কিনা খুঁজছে।

'নেই, কিশোর,' বললেন, পরিচালক, 'প্রথমেই ও-কথা ভেবেছি। স্টুডিওর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। অদৃশ্য কালি দিয়ে গোপন কিছু লেখা হয়নি। চিঠিটাই লেখা হয়েছে সাঙ্কেতিক ভাষায়। যে উকিল এটা অগাস্টের কাছে পাঠিয়েছে, সে জানিয়েছে, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে নাকি চিঠিটা লিখেছিলেন হোরাশিও অগাস্ট। উকিলের হাতে চিঠি দিয়ে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, সময় এলে যাতে এটা তাঁর নাতির কাছে পাঠানো হয়। তারমানে, যা কিছু বলার এই চিঠিতেই বলেছেন হোরাশিও। তো, কিছু বুঝলে?'

'ইয়ে,' সাবধানে বলল কিশোর, 'একদিক থেকে, বলতে গেলে চিঠির মানে খুব পরিষ্কার।'

'পরিষ্কার!' কোথায় রয়েছে ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'তুমি বলছ পরিষ্কার! আমার কাছে ওটা অমাবস্যার অন্ধকার!'

শুনলই না যেন কিশোর। ধ্যানমগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে চিঠিটার দিকে। হঠাৎ মুখ তুলল। 'একটা ব্যাপার একেবারেই স্পষ্ট, মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট এই চিঠির মানে তার নাতি ছাড়া আর কাউকে বুঝতে দিতে চাননি। কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছেন তিনি, গত পঞ্চাশ বছর ধরে। মহামূল্যবান কিছু একটা। আর কেউ জানলে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে, সেই ভয়ে নিজের নাতিকেও খুলে বলতে পারেনি, কোথায় রেখেছেন জিনিসটা। এটুকু পরিষ্কার।'

'হ্যাঁ, তা বটে,' মাথা দোলাল মুসা। 'কিন্তু বাকিটা কাদা-পানির মতই ঘোলা।'

'হয়তো,' আগের কথার খেই ধরল কিশোর, 'কিছু কথার গভীর মানে আছে। বাকি কথাগুলো একেবারেই ফালতু, লোককে বিপথে সরানোর জন্যে। গোড়া থেকেই শুরু করি: অগাস্ট তোমার নাম।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল অগাস্ট, 'আর অগাস্ট আমার খ্যাতি, সেটাও এক অর্থে ঠিক। অদ্ভুত নামের জন্যে স্কুলে প্রায়ই টিটকারি শুনতে হয় আমাকে, স্কুলের সবাই

একডাকে চেনে।'

'বুঝলাম,' রবিন বলল। 'কিন্তু অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য, এর মানে কী?'

'আমিও তাই ভাবছি,' কিশোর বলল। 'এক হতে পারে, অগাস্ট মাসের মধ্যে অগাস্ট তার জিনিসটা খুঁজে পাবে, এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু অগাস্ট না বলে অগাস্টে তোমার সৌভাগ্য বললেই ঠিক হত না?'

'হুমম! ভাল কথা ধরেছ,' বললেন চিত্র পরিচালক। 'এমনও হতে পারে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে যা এসেছে কলমের মাথায়, লিখে ফেলেছেন।'

মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। 'উঁহু! তা হতেই পারে না। ভেবেচিন্তে খুব সাবধানে লেখা হয়েছে। এখনও ঠিকমত মানে বুঝতে পারছি না আমরা, তাই উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে।'

'আর দু'দিন পরেই আমার জন্মদিন,' অগাস্ট বলল, 'ছ' তারিখে। অগাস্টের গোড়াতে জন্মেছি বলেই আমার নাম অগাস্ট রেখেছে আমার বাবা। বলেঃ অগাস্টের জন্মে যে অগাস্ট, তার নামও হবে অগাস্ট। দাদার লেখা কিংবা বাবার কথার সঙ্গে আমার জন্মদিনের কোন সম্পর্ক নেই তো?'

কথাটা ভেবে দেখল কিশোর।

'জানি না,' বলল সে। 'হতে পারে, তোমার জন্মদিন খুব কাছে বলেই চিঠিতে লেখা হয়েছে? সময় খুব মূল্যবান।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল যেন মুসা। 'এই ঘোর রহস্যের কিনারা মাত্র দু'দিনে! তা হলেই হয়েছে!'

'তুমি থামো তো,' বিরক্ত হয়ে বলল রবিন, 'ওকে বলতে দাও।'

চিঠির দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'দ্বিতীয় বাক্যটাঃ পাহাড়-প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করবে না, তোমার জন্ম তারিখে ছায়াতে-ই ওর অস্তিত্ব। প্রথম অর্ধেকটা বলছে, কিছুতেই পিছিয়ে আসবে না, কিন্তু শেষ অর্ধেকটা? নাহ্, বোঝা যাচ্ছে না।'

'আসলে, আমার জন্মের একটা ছায়া আছে,' অগাস্ট বলল, 'কালো ছায়া বলতে পারো। আমাকে জন্ম দিয়েই মারা যায় আমার মা। এটাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছে দাদা।'

'হয়তো,' কিশোরের কণ্ঠে সন্দেহ, 'তবে খাপে খাপে মিলছে না। পরের বাক্যটাঃ গভীরে খোঁড়ো, আমার কথার অর্থ শুধু তোমার জন্যেই। তারমানে, এই মেসেজ শুধু তোমার জন্যেই, ভালমত ভেবেচিন্তে এর মানে বের করো। কিন্তু গভীরে খোঁড়ার মানে কী? তারপরের বাক্যঃ স্পষ্ট করে বলতে পারছি না, তা হলে অন্যেরা বুঝে ফেলার ভয় আছে। এটা খুব পরিষ্কার কথা।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন পরিচালক। 'কিন্তু তারপরের বাক্যটা? ওটা আমার, ওটার জন্যে মূল্য দিয়েছি, ওটার মালিক হয়েছি, অথচ ওটার ভয়ে অস্থির আমি। এর কী মানে?'

'মিস্টার হোরাশিও বলেছেন,' কিশোর বলল, 'জিনিসটা তাঁর সম্পত্তি, ওটা নাতিকে দেয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু কোন কারণে জিনিসটার ব্যাপারে তাঁর একটা ভয়ও আছে, দারুণ ভয়।'

জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'তবে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে, অর্ধশতাব্দী পর নিশ্চয় ওটার পঙ্কিল ক্ষমতা দূর হয়ে গেছে। কিন্তু তবু ওটাকে জোর করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দখল করার উপায় নেই, ওটা হয় কিনতে হবে, কিংবা কারও কাছ থেকে পেতে হবে, কিংবা খুঁজে বের করতে হবে।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল সে। 'কিছু বুঝেছ?'

মুসা বলল, 'মিস্টার হোরাশিও বলছেন, জিনিসটা পঞ্চাশ বছর ধরে আছে তাঁর কাছে। এতদিনে ওটা বিশুদ্ধ হয়ে গেছে, লোকের ক্ষতি করার ক্ষমতা হারিয়েছে।'

'তা হলে ওটাকে বিপজ্জনক কেন মনে করেছেন মিস্টার হোরাশিও?' রবিন প্রশ্ন রাখল। 'কেন বলছেন: ওটাকে জোর করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দখল করা যাবে না? কেন সাবধানে থাকার জন্যে হুঁশিয়ার করছেন গাসকে? আরও একটা ব্যাপার, সময়ের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। কেন? সাবধানেও থাকতে বলছেন, একই সঙ্গে তাড়াহুড়োও করতে বলছেন।'

'শেষ লাইন,' কিশোর পড়ল, 'ওটা আর আমার সব ভালবাসা তোমাকে দিয়ে গেলাম।' মুখ তুলল সে। 'মেসেজ শেষ। কিছু কিছু বোঝা গেল, কিন্তু শুরুতে যে অন্ধকারে ছিলাম, সে-অন্ধকারেই রয়েছি।'

'অমাবস্যার অন্ধকার, আগেই বলেছি,' মুসা বিড়বিড় করল।

'মিস্টার হোরাশিও অগাস্টের সম্পর্কে ভালমত জানা দরকার,' অগাস্টের দিকে ফিরল কিশোর। 'গাস, তোমার দাদা কেমন মানুষ ছিলেন?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল ইংরেজ কিশোর। 'কখনও দেখিনি। পরিবারের "রহস্যময়" লোক সে। ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, এক সওদাগরী জাহাজে চেপে পাড়ি জমিয়েছিল দক্ষিণ সাগরে। কিছুদিন পর একটা চিঠি এল তার, তারপর নিয়মিত কয়েকটা। শেষে হঠাৎ করেই একদিন চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। পরিবারের সবাই ধরে নিল, জাহাজ ডুবে কিংবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছে হোরাশিও। অনেক দিন পর আবার তার খবর পেয়ে চমকে উঠল আমার বাবা। হলিউডের এক উকিলের কাছ থেকে চিঠি এল: জনাব হোরাশিও অগাস্ট এই ক'দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর নাতি অগাস্ট অগাস্টের জন্যে কিছু তথ্য আর সম্পদ রেখে গেছেন। বাবার চিঠির সঙ্গেই এই সাংকেতিক চিঠিটা ছিল।'

'চিঠি পেয়েই ইংল্যান্ড থেকে চলে এসেছ?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'যত তাড়াতাড়ি পেরেছি,' অগাস্ট জানাল। 'প্লেনে এলে আরও অনেক আগে আসতে পারতাম। কিন্তু টাকা নেই বাবার। অনেক চেষ্টা করে শুধু একজনের জাহাজ ভাড়া জোগাড় করেছে, তাই আমি একা এসেছি। কয়েক হপ্তা লেগেছে আসতে। চিঠিটা পেয়েছি প্রায় দু'মাস আগে।'

'এসেই নিশ্চয় উকিলের সঙ্গে দেখা করেছ?'

মাথা নাড়ল অগাস্ট। 'এসে ফোন করেছি, কিন্তু উকিল তখন শহরের বাইরে, তাই দেখা করতে পারিনি। আজ করার কথা। আমেরিকায় কাউকে চিনি না আমি আংকলকে ছাড়া,' মিস্টার ক্রিস্টোফারকে দেখাল অগাস্ট, 'বাবাও বিশেষ কাউকে চেনে না। সব শুনে আংকলই তোমাদের কথা বললেন, তোমাদের

সাহায্য চাইতে বললেন।'

'মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'তোমার সঙ্গে আমাদেরও উকিলের কাছে যাওয়া দরকার। তোমার দাদার ব্যাপারে জানা খুব জরুরী। কোন না কোন শত্রু পেয়ে যেতে পারি।'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা কাত করলেন পরিচালক। 'গাস, ওরা তোমাকে সাহায্য করবে। আর আমি তো আছিই। তো, এখন যাও, তোমাদের কাজ শুরু করো গিয়ে। আমারও জরুরী কয়েকটা কাজ আছে,' একটা ফাইল টেনে নিলেন তিনি।

ছেলেদেরকে দেখেই রাজকীয় রোলস রয়েস থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী ইংরেজ শোফার, হ্যানসন। দরজা খুলে ধরল।

পকেট থেকে আরেকটা চিঠি বের করল অগাস্ট। তাতে হলিউডের সেই উকিলের নাম আর ঠিকানা রয়েছে। শহরতলীর একটা ঠিকানা, উকিলের নাম রয় হ্যামার। কোথায় যেতে হবে হ্যানসনকে বলল কিশোর। নিঃশব্দে ছুটে চলল বিশাল রোলস রয়েস।

নানারকম আলোচনা চলল চার কিশোরের মাঝে। বেশিরভাগ প্রশ্ন করছে অগাস্ট, আমেরিকা, বিশেষ করে হলিউডের ব্যাপারে জানতে চাইছে সে, জবাব দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা।

চওড়া রাস্তা ছেড়ে সরু একটা গলিপথে গাড়ি নামিয়ে আনল হ্যানসন। পুরানো ধাঁচের ছোট একটা পুরানো বাড়ির সামনে এসে থামল।

'হুমম!' বাড়িটার দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে নামল গাড়ি থেকে। 'বেশি পুরানো। উকিল সাহেব বাড়িতেই অফিস করে, মনে হচ্ছে।'

দরজার পাশে বেলের সুইচের গা ঘেঁষে বসানো হয়েছে একটা নেম প্লেট। তাতে লেখা:

রয় হ্যামার
অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল
বেল বাজিয়ে ঢুকে পড়ুন

বোতাম টিপল কিশোর। বেলের শব্দ শোনা গেল। নির্দেশ দেয়া আছে, কাজেই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল সে, তার পেছনে অন্য তিনজন।

বসার ঘরটাকে অফিস বানিয়েছে হ্যামার। বড় একটা টেবিল, অনেকগুলো বুক শেলফে মোটা মোটা আইনের বই, আর কয়েকটা ফাইল কেবিনেট, তাতে ফাইল। একটা কেবিনেট খোলা, টেবিলে অগোছালো ভাবে পড়ে রয়েছে একটা ফাইল, কাগজপত্র এলোমেলো। টেবিলের পাশে উল্টে পড়ে আছে একটা চেয়ার। উকিল নেই ঘরে।

'কিছু একটা ঘটেছে।' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'গোলমাল!' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মিস্টার হ্যামার! মিস্টার হ্যামার! কোথায় আপনি?'

সাড়া নেই। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ছেলেরা।

আবার ডাকল কিশোর।

এইবার সাড়া মিলল। অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এল চাপা জবাব, ভাল

করে কান না পাতলে শোনাই যেত না।
'বাঁচাও! বাঁচাও! আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!'

চার

'আমাকে বাঁচাও!' আবার শোনা গেল চাপা কণ্ঠ। 'আমি মরে যাচ্ছি!'

'ওই যে!' উল্টো দিকের একটা দেয়াল আলমারির দরজা দেখাল মুসা, দুটো বুক শেলফের মাঝখানে দরজাটা। স্প্রিঙ লক লাগানো, পাল্লা ভেজিয়ে দিলে আপনাআপনি লেগে যায় এই তালা, ভেতর থেকে খোলা যায় না। নব ধরে মোচড় দিল মুসা, টান দিতেই হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা।

আলমারির মেঝেতে বসে রয়েছে ছোট্ট একজন মানুষ, হাঁ করে জোরে জোরে দম নিচ্ছে। সোনালি ফ্রেমের চশমায় সুতো বাঁধা, এক কান থেকে ঝুলছে চশমাটা। টাইয়ের নট ঢিলে, ঘাড়ের ওপর উঠে গেছে, বাঁকা হয়ে আছে টাই। সাদা চুল এলোমেলো।

'আহ্, বাঁচালে আমাকে!' ফিসফিস করে বলল লোকটা। 'ধন্যবাদ! ধরো, তোলো আমাকে, প্লীজ!'

আলমারির অপরিসর জায়গা থেকে লোকটাকে বের করে আনল মুসা আর রবিন, দাঁড়াতে সাহায্য করল।

উল্টে থাকা সুইভেল চেয়ারটা তুলে জায়গামত রাখল কিশোর। চেয়ারটা সোজা করেই ক্ষণিকের জন্যে স্থির হয়ে গেল, বিস্ময় ফুটল চেহারায়।

'আশ্চর্য!' আপনমনেই বিড়বিড় করল সে।

ধরে ধরে এনে লোকটাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল ছেলেরা। গভীর ভাবে কয়েকবার শ্বাস টানল সে। কাঁপা হাতে টাই ঠিক করল, চশমা বসাল নাকে।

'ঠিক সময়ে এসে পড়েছ!' গলা কাঁপছে এখনও তার। 'আরেকটু দেরি করলেই...!' শিউরে উঠল সে।

'আপনি নিশ্চয় মিস্টার রয় হ্যামার,' বলল রবিন।

এক এক করে চার কিশোরের ওপরই নজর বোলাল লোকটা। মাথা ঝোকাল। 'হ্যাঁ।' চোখ পিটপিট করল। 'কিন্তু তোমরা?'

'আমি অগাস্ট অগাস্ট, সার,' এগিয়ে এসে পরিচয় দিল ইংরেজ কিশোর। 'আজ আপনার সঙ্গে দেখা করার ডেট দিয়েছেন।'

'ও, হ্যাঁ,' আবার মাথা ঝোকাল উকিল। 'এরা তোমার বন্ধু, না?'

'এতে আমাদের পরিচয় পাবেন, স্যর,' তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরল কিশোর।

'গোয়েন্দা!' কার্ডটা পড়ে অবাক হয়েছে হ্যামার।

'আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে ওরা,' অগাস্ট বলল।

'তাই?' আবার চোখ পিটপিট করল উকিল। আরেকবার তাকাল কার্ডটার দিকে। 'সুন্দর! খুব সুন্দর!'

চুপ করে রইল গোয়েন্দারা। অগাস্টও।

'তা হলে তোমরা গোয়েন্দা!' বিড়বিড় করল উকিল। 'খুব ভাল খুব ভাল। যার যা হওয়ার ইচ্ছে, ছোটবেলা থেকে সে পথে যাওয়াই ভাল।...হায় হায়!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আসল কথাই ভুলে গেছি! ব্যাটারা, ব্যাটারা আমাকে আটকে রেখেছিল!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল উকিল। চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়ে খোলা কেবিনেটটার ওপর দৃষ্টি আটকাল। 'হায় হায়! আমার ফাইল, গোপন কাগজপত্র! হারামজাদা আমার ফাইল ঘেঁটেছে। কী জানি নিল! আর এটা এখানে কেন!' টেবিলের ফাইলটার দিকে আঙুল তুলল সে। 'আমি তো রাখিনি!'

ফাইলের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল উকিল, দ্রুত পাতা উল্টে চলল, দেখছে, কোন কাগজটা নেই।

'তোমার দাদার ফাইল এটা,' অগাস্টকে বলল হ্যামার। 'বিশ বছর ধরে ওঁর উকিল ছিলাম। ওঁর সম্পর্কে যত কাগজপত্র, সব এই ফাইলে রেখেছি। এটার প্রতি আগ্রহ হবে কেন!...মেসেজ,' চেঁচিয়ে উঠল উকিল, 'মেসেজটা নিয়ে গেছে!'

অগাস্টের দিকে তাকাল হ্যামার। 'তোমাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছি, তার নকল! নিয়ে গেছে!...লেখাটা আগাগোড়াই অবশ্য অর্থহীন মনে হয়েছে আমার কাছে। তবু একটা কপি করে রেখেছিলাম। কেবিনেটে রেখেছি ফাইল, এর চেয়ে সাবধান আর হয় কী করে লোকে! কিন্তু দেখলে তো, গেল চুরি হয়ে!'

'কী হয়েছিল, সার, খুলে বলবেন?' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। 'ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে!'

কাগজগুলো গুছিয়ে ঠিকঠাক করে ফাইলটা আবার কেবিনেটে রাখল উকিল। ড্রয়ার ঠেলে লাগিয়ে তালা আটকে দিল। তারপর বসল আবার চেয়ারে।

রয় হ্যামারের বক্তব্য: ডেস্কে বসে কাজ করছিল সে, এই সময় কোনরকম সাড়া না দিয়ে দরজা খুলে একটা লোক এসে ঘরে ঢুকল। মাঝারি উচ্চতা, কালো পুরু গোঁফ, চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা। উকিল মুখ খোলার আগেই দুই লাফে কাছে চলে এল আগন্তুক, থাবা দিয়ে হ্যামারের নাকের ওপর থেকে চশমা ফেলে দিল, ধাক্কা দিয়ে তাকে চেয়ারসহ উল্টে ফেলল মেঝেতে, তারপর টেনে নিয়ে গিয়ে ভরল আলমারিতে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল, আপনাআপনি লেগে গেল অটোমেটিক তালা।

প্রথমে, দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে হ্যামার, চেঁচামেচি করে, সাহায্য চায়। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারল, শক্তি আর আলমারির ভেতরের অক্সিজেন ক্ষয় করছে বৃথাই। বাড়িতে কোন চাকর-বাকর কিংবা আর কেউ নেই যে তার চিৎকার শুনবে। তাই চুপ করে গেল।

কয়েক মিনিট পর বাইরে বেরোনোর দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনল উকিল, বুঝল, তার আক্রমণকারী বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার আলমারির দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু করল সে, খোলার চেষ্টা করল। শেষে হাল ছেড়ে দিল।

'কী আর করব, মেঝেতেই বসে পড়লাম!' বলল হ্যামার। 'জানি, আলমারির ভেতর যে বাতাস রয়েছে, তাতে আরও কয়েক ঘণ্টা টিকব। কপাল ভাল হলে কেউ

না কেউ এসে পড়তে পারে। ঈশ্বরের দয়া, তোমরা এলে।'

'কটার সময় এটা ঘটেছিল!' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'শিওর না,' জবাব দিল উকিল। 'এই ধরো,' হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে। নয়টা সতেরো বেজে বন্ধ হয়ে আছে কাঁটা, তারমানে দেড় ঘণ্টার ওপরে।'

'আমার ঘড়ি!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ব্যাটা যখন ধাক্কা দিয়ে ফেলল আমাকে, নিশ্চয় চোট লেগেছে! গেছে নষ্ট হয়ে।'

'তারমানে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'যে-ই এই কাজ করেছে, দুঘণ্টা সময় পেয়েছে হাতে। পালানোর। কোথায় আছে এখন কে জানে! এমন কিছু লক্ষ করেছেন? এমন কিছু, যা লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারে!'

'না। এতই চমকে গিয়েছিলাম, কিছুই খেয়াল করতে পারিনি। তা ছাড়া সময়ও দেয়নি সে আমাকে। পুরু গোঁফ, আর ভারি চশমা! ও হ্যাঁ, চশমার কাচের ওপাশে তার চোখ যেন জ্বলছিল!'

'না, এতে চলবে না,' মুসার কণ্ঠে নিরাশা।

'না, চলবে না,' কিশোরও একমত হলো। 'আচ্ছা, এ ঘরে এমন কিছু দেখেছেন, যেটা অস্বাভাবিক ঠেকছে?'

পুরো অফিস ঘরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল উকিল। 'না, তেমন কিছুই তো না। মনে হচ্ছে, আমাকে আলমারিতে ভরেই সোজা ফাইল কেবিনেটের দিকে গেছে, কেবিনেট খুলে ফাইল বের করেছে, যা দরকার নিয়ে চলে গেছে। ব্যস।'

'হুঁম্‌ম্‌!' বিড়বিড় করল কিশোর, আপনমনেই বলল, 'তারমানে, কী খুঁজছে, জানা ছিল তার। জানা ছিল, ঠিক কোথায় ওটা পাওয়া যাবে! কয়েকটা কেবিনেটের এতগুলো ড্রয়ারের মধ্যে ঠিক ড্রয়ারটাই খুলল, ঠিক ফাইলটা বের করে আনল! অসংখ্য ফাইল, এত সহজে কী করে তা সম্ভব। তা ছাড়া মেসেজটা ফাইলে আছে, তা-ই বা জানল কী করে সে?'

চোখ পিটপিট করল আবার উকিল। 'ইয়ে...মানে...কী জানি!'

'মিস্টার হোরাশিও মেসেজটা লেখার সময় আর কেউ কাছে ছিল?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা নোয়াল হ্যামার, 'ওঁর দু'জন চাকর-চাকরাণী। ওরা স্বামী-স্ত্রী। বুড়ো-বুড়ি। মিস্টার অগাস্টের চাকরি করেছে অনেক বছর। বাড়িঘর দেখাশোনা, বাগান পরিষ্কার, বাজার, রান্নাবাড়া, প্রায় সব কাজই করেছে। বুড়োটার নাম হ্যারি, হ্যারিসন। মনিবের মৃত্যুর পর স্যানফ্রানসিসকোতে চলে গেছে ওরা। মেসেজটার কথা হয়তো শুনেছে ওরা, তারপর যে-ই মনিব মরেছে, তাঁর নাতিকে ফাঁকি দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।'

'কিংবা কথায় কথায় অন্য কাউকে বলেছে ওরা,' মুসা সন্দেহ করল। 'হয়তো সেই তৃতীয়জন অনুমান করেছে, মিস্টার হ্যামারের কাছে মেসেজের কপি আছে! নিতে এসেছে।'

'তা-ও হতে পারে,' উকিল বলল। 'ওরা হয়তো ভেবেছে, মিস্টার হোরাশিও গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছে। সাংকেতিক চিঠিতে মূল্যবান কিছুর কথা লেখা থাকলেই

লোকে ধরে নেয়, গুপ্তধন, কিংবা চোরাই টাকা। সেগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। সত্যি কথা কী, মিস্টার হোরাশিও খুব গরীব অবস্থায় মারা গেছেন। তাঁর বাড়িটা পর্যন্ত বাঁধা ছিল অন্যের কাছে, সেই লোকটা এখন বাড়ি দখল করে নিয়েছে। বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি করে দোকানের বকেয়া বিল দিয়েছি, অনেক টাকা বাকি ফেলে গিয়েছিলেন হোরাশিও।'

'কিন্তু মেসেজ বলছে, মূল্যবান কিছু আমার জন্যে রেখে গেছে দাদা,' অগাস্ট প্রতিবাদ করল। 'এমন কিছু, কোন কারণে সেটাকে ভয় পেত সে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' চশমা খুলে কাঁচ পরিষ্কার শুরু করল উকিল। 'কী জিনিস, আমিও জানি না, আমাকেও বলেনি। কথায় কথায় অনেকবার বলেছেন: রয়, আমার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো না তুমি, জানার চেষ্টাও কোরো না, আমি গোপনই রাখতে চাই। আমার নামেও গোলমাল আছে। আর হ্যাঁ, বাদামী চামড়া, কপালে উলকি দিয়ে তিনটে বিন্দু আঁকা রয়েছে, এমন কোন মানুষকে যদি কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে দেখো, বুঝবে তুমুল ঝড় আসছে!

'আজব লোক ছিলেন মিস্টার ওয়েসটন...ইয়ে, মিস্টার হোরাশিও। অদ্ভুত, কিন্তু ভাল মানুষ। তাঁর গোপন ব্যাপার নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি, বলার জন্যে তাঁকে চাপাচাপি করিনি।'

'মিস্টার হোরাশিওর আরেক নাম ওয়েসটন ছিল?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, হেনরি ওয়েসটন নামেই হলিউডে পরিচিত ছিলেন। আমিও ওই নামই জানতাম। মৃত্যুর আগে আমাকে ডেকে আসল নাম বললেন, নাতির নাম-ঠিকানা জানালেন, নইলে চিঠি পাঠাতে পারতাম না।'

কেবিনের দিকে নজর ঘুরে গেল কিশোরের, সেই ড্রয়ারটার দিকে তাকাল, যেটাতে মিস্টার হোরাশিও অগাস্টের ফাইল রেখেছে উকিল।

'মিস্টার হ্যামার,' ড্রয়ারটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর, 'ভুল ড্রয়ারে রাখেননি তো ফাইলটা? অগাস্টের আদ্যাক্ষর এ, কিন্তু ওয়েসটনের বেলায়? নাকি ফাইলে নাম বদলে অগাস্টই লিখেছেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। এসব ব্যাপারে সাবধান থাকি আমি, কাগজপত্র নিখুঁত রাখার চেষ্টা করি।'

'কিন্তু ওই লোকটা জানল কী করে? কেন সে ওয়েসটন খুঁজতে ডাবলিও লেখা ড্রয়ার খুলল না?'

'কী জানি,' ছাতের দিকে তাকাল উকিল। 'হয়তো, হয়তো হ্যারিসনরা কোনভাবে আসল নাম জেনে ফেলেছিল...ও, হ্যাঁ। একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদের।'

উঠে গিয়ে 'এ' লেখা ড্রয়ারটা খুলে এক টুকরো কাগজ বের করল হ্যামার। একটা পেপার কাটিং। 'দৈনিক লস অ্যাঞ্জেলেস। এক খুঁতখুঁতে রিপোর্টার সন্দেহ করে বসেছিল, মিস্টার ওয়েসটনকে রহস্যময় লোক মনে হয়েছিল তার। খোঁজখবর শুরু করল। একদিন আমার কাছে এসে হাজির, তখন হোরাশিও মারা গেছেন, তাঁর আসল নাম গোপন করার আর কোন মানে দেখলাম না। বলে দিয়েছি

রিপোর্টারকে। হোরাশিওর অতীত জীবন সম্পর্কে সামান্য যা জানি, তা-ও বলেছি। কাগজে বেরিয়েছে, যে কেউ জেনে যেতে পারে তাঁর আসল নাম।'

কাগজের টুকরোটা কিশোরের হাতে দিল উকিল।

অন্য তিনজন ঘিরে এল কিশোরকে, কাগজের লেখা দেখতে।

ছোট অক্ষরে আকর্ষণীয় হেডলাইন: ডায়াল ক্যানিয়নের নির্জন বাড়িতে রহস্যময় লোকটির মৃত্যু!

দ্রুত লেখাটা পড়ে ফেলল কিশোর। জানা গেল, বিশ বছর আগে হেনরি ওয়েসটন ছদ্মনাম নিয়ে হলিউডে এসেছিলেন হোরাশিও অগাস্ট। তার আগে অনেক বছর কাটিয়েছেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে। ওখানে থাকতেই প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। তরুণ বয়েস তখন, দক্ষিণ সাগর থেকে শুরু করে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি জমিয়েছেন, বোধহয় ব্যবসার খাতিরেই।

হলিউডের উত্তরে নির্জন পাহাড়ী এলাকায় জায়গা কিনে মস্ত বাড়ি বানিয়েছিলেন হোরাশিও অগাস্ট। লোকালয় থেকে দূরে থেকেছেন যেন ইচ্ছে করেই। এত বড় বাড়ি দেখাশোনার জন্যে লোক রেখেছিলেন মাত্র দুজন। কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না তাঁর। পুরানো ঘড়ি আর বই সংগ্রহের বিচিত্র নেশা ছিল তাঁর, বিশেষ করে ল্যাটিন ভাষায় লেখা বই। স্যর আর্থার কোনান ডয়েলের ওপর ছিল তাঁর অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা, ডয়েলের লেখা সমস্ত বইয়ের যতগুলো সংস্করণ পেয়েছেন, সবগুলোর কপি জোগাড় করেছেন তিনি। ছেলেবেলায় ইংল্যান্ডে থাকতে একবার বিখ্যাত ওই লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল হোরাশিওর, তারপর থেকেই তাঁর অন্ধভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ভক্ত হয়েছিলেন কোনান ডয়েলের অসামান্য সৃষ্টি গোয়েন্দা শার্লক হোমসের।

যতদূর জানা যায়, শান্তিতেই ডায়াল ক্যানিয়নের বাড়িতে বিশ বছর কাটিয়েছেন হোরাশিও অগাস্ট নামের রহস্যময় লোকটি! অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন, কিন্তু কিছুতেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়নি তাঁকে। নিজের বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে মরার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর, সে-জন্যেই হাসপাতালে যেতে চাননি। যা-ই হোক, শেষ ইচ্ছে পূরণ হয়েছে মানুষটির।

লম্বা, সুদর্শন এক সুপুরুষ ছিলেন হোরাশিও অগাস্ট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, একটা ছবি নেই তাঁরও বাড়ি থেকে যেমন বেরোতে চাইতেন না, ছবি তোলার ব্যাপারে ছিল তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণা। তাঁর একমাত্র আত্মীয় থাকে ইংল্যান্ডে। ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেটে লিখেছেন: হোরাশিও অগাস্টের শরীরে অজস্র কাটা দাগ। তরুণ বয়েসের অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের চিহ্ন বোধহয় ওই ছুরিতে কাটা দাগগুলো।

হোরাশিও অগাস্টের রহস্যময় অতীত রহস্যেই ঢাকা পড়ে আছে, বিশেষ কিছুই জানা যায়নি।

'আরিব্বাপ!' ফোঁস্ করে শ্বাস ফেলল মুসা। 'সত্যিই রহস্যময়। লোক!'

'ছুরির দাগ!' বিড়বিড় করল অগাস্ট। 'অভিযান প্রিয়! চোরাচালানি ছিলেন না তো?'

'কারও ভয়ে যে লুকিয়েছিলেন,' রবিন বলল, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথমে ওয়েস্টইনডিজে গিয়ে লুকিয়েছিলেন, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে লুকিয়েছেন ডায়াল ক্যানিয়নে। লস অ্যাঞ্জেলেস আর হলিউডের হাজার রকম লোকের ভিড়ে সহজেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবেন, আশা করেছিলেন হয়তো।'

'বোধহয় পেরেছেনও,' রবিনের কথার পিঠে বলল কিশোর, 'নিজের বিছানায় শান্তিতেই চোখ বুজতে পেরেছেন। কিন্তু কেন এই ঘরকুনো মন? কার ভয়ে? বাদামী চামড়া, কপালে তিনফোঁটাওয়ালা লোকটাই বা কে?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল অগাস্ট। 'মনে পড়েছে! দশ বছর আগে, সেই ধোঁয়াটে শৈশবে...,' নাকমুখ কুঁচকে মনে করার চেষ্টা চালাল সে। 'এক রাতে, সবে বিছানায় গিয়ে শুয়েছি। হঠাৎ নীচে কথা শুনলাম, কার সঙ্গে জানি উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে বাবা। বলল, 'কতবার বলব, চাচা কোথায় আছে জানি না! অনেক আগেই শুনেছি মারা গেছে! কোটি টাকা দিলেও সে কোথায় আছে বলতে পারব না!

'বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বসার ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বাবা আর অচেনা একটা লোক। নিচু গলায় কিছু বলল লোকটা, শুনতে পেলাম না। জবাবে জোরে জোরে বলল বাবা: তোমার কাছে কোনটা কত জরুরী ওসব জানার দরকার নেই আমার! রক্তচক্ষুর নাম জীবনেও শুনিনি! চাচাও কখনও লেখেনি ওটার কথা। এখন বেরোও, আমি ঘুমাব।

'মাথা নুইয়ে বাবাকে বাউ করল লম্বা লোকটা, তারপর হ্যাট তুলে নেয়ার জন্যে ঘুরল। এই সময় ওপরে তাকাতেই আমার দিকে চোখ পড়ল তার, কিন্তু আমাকে দেখেও যেন দেখল না। হ্যাটটা তুলে নিয়ে আরেকবার বাবাকে বাউ করে বেরিয়ে গেল। বাবা কখনও ওর কথা আমাকে বলেনি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি, লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যের কথা শোনা বাবা একদম পছন্দ করে না।

'জানো,' কণ্ঠস্বর খাদে নামাল অগাস্ট, 'ওই লোকটার রঙ ছিল বাদামী, কপালে তিনটে ফোঁটা। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি উলকি দিয়ে আঁকা হয়েছিল।'

'অউ!' বিচিত্র শব্দ করে উঠল রবিন। 'তোমার বাবার কাছে তোমার দাদার খোঁজ চেয়েছিল তিন-ফোঁটা!'

'বাবা মিথ্যে বলেনি। সত্যিই জানত না তখন দাদা কোথায় আছে।'

'রক্তচক্ষু!' আনমনে বলল কিশোর। 'মিস্টার হ্যামার, ওরকম কিছুর কথা কখনও বলেছিলেন মিস্টার হোরাশিও?'

'না,' মাথা দোলাল উকিল। বিশ বছর ধরে তাঁকে চিনতাম। কখনও ওই শব্দ উচ্চারণ করেনি। ইস্‌স্‌, রিপোর্টার ব্যাটার কাছে মুখ খুলে ভুলই করেছি! তখন কি আর জানতাম...ভেবেছি, মৃত লোকের আর কী এমন ক্ষতি করবে সে? একটা কথা অবশ্য বলিনি ওকে, শেষ দিকে কেমন জানি সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকতেন হোরাশিও। শত্রুরা যেন ঘিরে রেখেছে তাঁকে, তাঁর ওপর চোখ রাখছে। আমাকেও অবিশ্বাস করতেন তখন। কল্পিত শত্রুদের কাছ থেকে কী জানি লুকিয়ে রাখতে

চেয়েছেন।' অগাস্টের দিকে তাকাল হ্যামার। 'তারপরই তোমার কাছে সাংকেতিক চিঠি পাঠালেন তিনি।'

'হুঁ!' বলল কিশোর, 'মিস্টার হেরাশিওর কথা আপনার কাছে জানতে এসেছিলাম, জেনেছি। একবার ডায়াল ক্যানিয়নে যেতে চাই। কী বলেন? ওখানে নতুন কিছু জানতে পারব?'

'আমার মনে হয় না,' উকিল বলল। 'একেবারে খালি বাড়ি। বললামই তো, ধার শোধ করার জন্যে তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র বেচে দিয়েছি। বই, আসবাবপত্র, সব। যে লোকের কাছে বাড়ি বাঁধা ছিল, তিনি তিন-চার দিনের মধ্যেই বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করবেন। নতুন বাংলো তুলবেন ওখানে।

'তবে, তোমরা যেতে চাইলে, যাও। কিছু পাবে কিনা জানি না। গতকাল পর্যন্ত কয়েকটা বই ছিল, আর কয়েকটা মূর্তি, আবক্ষ মূর্তি। বিখ্যাত লোকদের মূর্তি। গতকাল ওগুলো এক স্যালভেজ ইয়ার্ডের মালিকের কাছে নিলামে বেচে দিয়েছি...'

'আবক্ষ মূর্তি!' বোলতা হুল ফোটাল যেন কিশোরের গায়ে। 'মিস্টার হ্যামার, আমরা যাই। যা জানার জেনেছি। থ্যাংক ইউ।'

দরজার দিকে রওনা দিল কিশোর। অবাক হয়ে তাকে অনুসরণ করল মুসা, রবিন আর অগাস্ট।

ঘষে ঘষে রোলস রয়েসের কালো উজ্জ্বল শরীরকে আরও চকচকে করে তুলছে হ্যানসন, গাড়িটাকে ভালবাসে সে।

'হ্যানসন, জলদি বাড়ি চলুন!' তাড়া দিল কিশোর। 'যত তাড়াতাড়ি পারেন!'

নিঃশব্দে রকি বীচের দিকে ছুটল গাড়ি। গতিবেগ ইচ্ছেমত বাড়ানোর উপায় নেই, ট্রাফিক আইনে গতিবেগ বেঁধে দেয়া আছে।

'হঠাৎ এত তাড়া কেন, কিশোর?' আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলল মুসা।

'রক্তচক্ষু!' মুচকি হাসল গোয়েন্দাপ্রধান।

'কী!' ভুরু কুঁচকে গেল মুসার।

মিটিমিটি হাসছে কিশোর। 'রহস্য ভেদ।'

হাঁ হয়ে গেছে অগাস্ট। 'সত্যি বলছ!'

'মনে তো হয়,' কিশোর জবাব দিল। 'তোমার দাদার শার্লক হোমস প্রীতি আর আবক্ষ মূর্তিতেই রয়েছে রহস্যের সমাধান।'

'তুমিই জানো কী বলছ।' গোঁ গোঁ করে করে উঠল মুসা। 'শার্লক হোমস...আবক্ষ মূর্তি...সাংকেতিক চিঠির সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

'পরে খুলে বলব,' কিশোর বলল। 'আপাতত একটা লাইন নিয়েই আলোচনা করা যাক। অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য?'

'কী সৌভাগ্য?' শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল মুসা।

অগাস্টও কিছুই বুঝতে পারছে না।

কিন্তু রবিন বুঝে ফেলল। 'আবক্ষ মূর্তি...রাশেদ চাচা যেগুলো কিনে এনেছেন! ওয়াশিংটন...লিংকন...আর, আর অগাসটাস অভ পোল্যান্ড...'

'অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য!' উত্তেজিত হয়ে পড়ল অগাস্ট। 'অগাস্ট... অগাসটাস! তারমানে অগাসটাসের মূর্তির ভিতরে কিছু লুকানো রয়েছে!'

'আমি শিওর,' কিশোর বলল। 'খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। শার্লক হোমস পড়তে ভালবাসতেন তোমার দাদা। কোনান ডয়েলের একটা গল্পের নাম: দ্য অ্যাডভেঞ্চার অভ দ্য সিক্স্ নেপোলিয়নস, তাতে নেপোলিয়নের মূর্তির ভেতরে একটা মূল্যবান জিনিস লুকানো থাকে। ওটা পড়েই বুদ্ধি এসেছে মিস্টার হোরাশিও অগাস্টের মাথায়। সাধারণ একটা মূর্তির ভিতরে রক্তচক্ষু লুকানো আছে এটা কেউ ভাববে না। অগাসটাসকে বেছে নিয়েছেন, কারণ, এর সঙ্গে অগাস্ট নামের মিল রয়েছে।'

ক্ষণিকের জন্যে চুপ হয়ে গেল অন্য তিন কিশোর, তারপরই ফেটে পড়ল উল্লাসে।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেট দেখা গেল। গেটের সামনে এসে গাড়ি থামাল হ্যানসন। সে নেমে দরজা খুলবে কখন? তার আগেই ঝটকা দিয়ে দু'দিকের দরজা খুলে গেল, হুড়মুড় করে নেমে পড়ল চার কিশোর।

অফিসের কাছে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মূর্তিগুলো সেদিকে চেয়েই দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে যেন থেমে গেল কিশোর। গায়ের ওপর এসে পড়ল অন্য তিনজন আরেকটু হলে ধাক্কা দিয়ে মাটিতেই ফেলে দিয়েছিল তাকে। ওরাও দেখল, বুঝল, কেন ওভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে কিশোর।

সকাল বেলাও যে টেবিলটাতে তেরোটা মূর্তি সাজানো ছিল, এখন সেখানে রয়েছে মাত্র পাঁচটা: ওয়াশিংটন, ফ্র্যাঙ্কলিন, লুথার এবং থিওডর রুজভেল্ট।

অগাসটাস অভ পোল্যান্ড-এর মূর্তিটা নেই।

পাঁচ

পায়ে পায়ে এগোল চার কিশোর। টেবিলের ওপাশে অফিসের দেয়ালে বড় করে লেখা একটা নোটিশ টাঙানো: মূর্তি দিয়ে বাগান সাজাতে চান? মাত্র পঞ্চাশ (৫০.০০) ডলার, প্রতিটি।

হতাশায় কালো হয়ে গেছে ছেলেদের মুখ।

কাচেঘেরা ছোট্ট অফিস ডেস্কে বসে কী যেন পড়ছেন মেরিচাচী।

ঢোক গিলল কিশোর, গলা চড়িয়ে ডাকল, 'চাচী! আর মূর্তি কই?'

'বল তো কোথায়?' দরজায় বেরিয়ে এলেন চাচী, হাসি হাসি মুখ।

'বিক্রি হয়ে গেছে?'

'নিশ্চয়। আজ শনিবার, মনে নেই? শনিবারে সবচেয়ে বেশি কাস্টোমার আসে জানিসই তো। অনেকেই এসেছিল, চোখে পড়ল, পছন্দ হলো, আর কী রাখে? দামও কম। নিয়ে গেল।'

নিজের অজান্তেই মুখ বিকৃত করল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেসের লোকগুলো পাগল! আর শনিবার-রোববারে যেন বদ্ধ পাগল হয়ে যায়! কী করে, না করে তার ঠিক নেই! কিছু একটা যেন কিনতেই হবে, এমনকী পুরানো বাতিল মালের চত্বরেও

ভিড় জমে যায়। 'দূর্‌র্‌!' বিরক্তি চাপতে পারল না সে। 'চাচী, যারা নিল, তাদের নাম-ঠিকানা রেখেছ?' বলেই বুঝল, বোকার মত প্রশ্ন করে ফেলেছে।

'এই দেখো, দিন দিন জ্ঞান বাড়ছে! ওদের নাম-ঠিকানা রাখতে যাব কেন আমি? টাকা দিল, জিনিস নিয়ে চলে গেল। ওদেরকে আর কী দরকার আমার?'

'যারা নিয়েছে, তাদের চেহারা কেমন মনে আছে? অগাসটাস অভ পোল্যান্ডটা যে নিল?'

'কী ব্যাপার, বল তো কিশোর?' ভুরু কুঁচকে গেছে মেরিচাচীর। 'হঠাৎ ওই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন?'

চুপ করে রইল কিশোর।

কী বুঝলেন চাচী, কে জানে; বললেন, 'কালো স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এসেছিল এক লোক, সে কিনেছে দুটো মূর্তি। মনে হলো, উত্তর হলিউডে থাকে সে। এক মহিলা নিয়েছে দুটো, মালিবুতে থাকে–জিজ্ঞেস করেছিলাম। লাল একটা সিড্যানে করে এসেছিল। বাকি চারটে কারা যে নিল, মনে করতে পারছি না। খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'চলো হে, ভেবে দেখি, এরপর কী করা যায়।'

ওয়ার্কশপে এসে ঢুকল ওরা। পাইপের মুখ থেকে লোহার পা সরাতে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল অগাস্টের। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে তাকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

খুদে ল্যাবরেটরিটা দেখানো হলো মেহমানকে। ডার্করুম দেখাল অগাস্ট। 'সর্ব-দর্শন' পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখল, সাজানো গোছানো ছোট্ট অফিস আর সরঞ্জাম দেখে তাজ্জব হয়ে গেল।

চেয়ারে বসল সবাই।

'এবার?' মুসা শুরু করল। 'এবার কী? অগাসটাসের মূর্তি গেল, সে সঙ্গে অগাস্টের জিনিসও। কোথায় কার বাগানে এখন শোভা বাড়াচ্ছে মূর্তিটা, কে জানে! লস অ্যাঞ্জেলেস আর তার আশপাশে কম করে হলেও হাজারখানেক বাগান আছে, ওগুলোর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করা! এ-জীবনে হবে না!' হাত নাড়ল সে।

'তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে,' নিরাশা গোপনের চেষ্টা করল অগাস্ট। 'ইস্‌স্‌, গতকালই যদি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতাম! আজ সকালে একেবারে...যাকগে। যা গেছে, সেটা নিয়ে ভেবে কিছু হবে না। এখন কী করা যায়? দাদা সময়ের ওপর জোর দিয়েছে, তারমানে বেশি সময়ও নেই আমাদের হাতে। তার দুর্ভাবনা ছিল, তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে জিনিসটা আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। গেলও তাই।'

'হয়তো চিরতরেই গেল,' অবশেষে মুখ খুলল কিশোর। 'কিন্তু এত সহজে পরাজয় মেনে নিতে পারব না। খুঁজে বের করবই।'

'কীভাবে?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'জানি না। ভাবতে হবে।'

'আচ্ছা!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'এক কাজ করলেই তো পারি! ভূত-থেকে-ভূতে!'

'ভূত-থেকে-ভূতে!' চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন অগাস্টের। 'প্রেতজগতের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নাকি তোমাদের!'

'না,' হাসল রবিন। 'তবে কিশোর জগতের সঙ্গে আছে। এটা খুব ভাল আবিষ্কার, অবশ্যই কিশোরের। আচ্ছা, বলো দেখি, আশপাশে কী আছে না আছে কারা বেশি খেয়াল করে? এই, নানারকম অদ্ভুত জিনিসপত্র?'

'কেন...,' বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল অগাস্ট। 'জানি না!'

'অবশ্যই বাচ্চারা,' মুসা বলল। 'বাচ্চাদেরকে বড়রা দেখেও দেখে না, ফলে বাচ্চারা এমন সব জায়গায় সহজেই ঢুকে যেতে পারে, যেখানে ঢোকা বড়দের জন্যে কঠিন। তা ছাড়া, নানারকম জিনিসের দিকে বাচ্চাদের আকর্ষণ, এই যেমন, কুকুর, বেড়াল, কোন পাড়ায় নতুন কোন ছেলে বা মেয়ে এল, কোথায় কার বাগানে ফল পাকল, কোন বাগানে প্রজাপতি বেশি, এমনি সব ব্যাপার। বড়রা এসব খেয়ালই করে না।'

'বাচ্চারা একে অন্যকে সাহায্য করতে চায়, খুব খুশি হয়ে, নিঃস্বার্থভাবে,' মুসার কথার পিঠে বলল রবিন। 'আর রহস্যের গন্ধ পেলে তো কথাই নেই।'

'কিন্তু কজন বাচ্চাকে চেনো তোমরা?' অগাস্টের প্রশ্ন। 'এত বড় শহর। সবগুলো বাগান খুঁজতে হলে শহরের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েকেই কাজে লাগাতে হবে। কী করে সম্ভব।'

'ভূত-থেকে-ভূতের সাহায্যে,' হাসল মুসা। 'খুব সহজ। আমাদের সবারই অন্তত কয়েকজন করে বন্ধু আছে, সব ছেলেমেয়েরই থাকে। কিছু জানার দরকার হলে, আমরা আমাদের বন্ধুদেরকে ফোন করব। তারা আবার তাদের বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করবে। সেই তারা আবার তাদের বন্ধুদেরকে। এভাবে ছড়াতে থাকলে, অবস্থাটা কী দাঁড়ায়, ভেবে দেখো। কোন বাগানে নতুন মূর্তি বসানো হয়েছে, জানাটা আর তত কঠিন মনে হচ্ছে?'

হাঁ করে আছে অগাস্ট।

'এখনও বুঝলে না?' আবার বলল মুসা। 'আচ্ছা ধরো, আমাদের তিন জনের,' রবিন আর কিশোরকে দেখাল মুসা, 'পাঁচজন করে বন্ধু আছে। তাদেরকে ফোন করে মূর্তির কথা জিজ্ঞেস করলাম আমরা। তারা হয়তো কিছু বলতে পারল না, কিন্তু তাদের পাঁচজন করে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে পারবে। ওরা আবার তাদের পাঁচজন করে বন্ধুকে। কী ঘটবে? দাবানলের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়বে পুরো লস অ্যাঞ্জেলেসে। কতগুলো ছেলেমেয়ে আছে এই শহরে? সবাই না হোক, তাদের অর্ধেকেও যদি একটা মূর্তি খুঁজতে শুরু করে...'

'হয়েছে, হয়েছে! আর বোলো না!' হাত নাড়তে শুরু করল অগাস্ট। 'বুঝতে পেরেছি! আরিব্বাপরে!' হিসেব শুরু করল সে। 'তোমরা তিনজনে পাঁচজন করে বললে হবে পনেরো জন, তারা বলবে পঁচাত্তর জনকে, সেই তারা আবার তিনশো পঁচাত্তর...পরের বারেই হাজার পেরোবে! সাংঘাতিক কাণ্ড!' শিস দিয়ে উঠল সে।

'এই পদ্ধতির নাম রেখেছি আমরা ভূত-থেকে-ভূতে,' গর্বের সঙ্গে বলল রবিন। 'সাংঘাতিক নাম। বড়দের সামনে বললেও ক্ষতি নেই, কিছুই বুঝবে না। বড়জোর হাসবে, বলবে, বাচ্চাদের খেয়াল!'

'তোমরা জিনিয়াস!' প্রশংসা না করে পারল না অগাস্ট। কিশোরের দিকে ফিরল। 'এখুনি ফোন করবে?'

'আজ শনিবার,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'বিকেলও হয়ে এসেছে। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই এখন বাইরে। ডিনারের আগে ফোন করে লাভ নেই। কয়েকটা ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই হচ্ছে...'

'কিশোর!' মেরিচাচীর ডাকে বাধা পড়ল কথায়। ট্রেলারের হাতে স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে আসছে শব্দ। 'এই কি-শো-র! কোথায় তোরা?'

ডেস্ক থেকে মাইক্রোফোন তুলে নিল কিশোর। ছাতে বসানো রয়েছে ছোট একটা শক্তিশালী স্পীকার, ভেতর থেকে বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইলে এটা ব্যবহার করে সে। আরও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। 'আমি এখানে, চাচী,' জবাব দিল সে। 'দরকার?'

'ওই দেখো, এবার স্পীকার লাগিয়েছে! জঞ্জালের ভেতর বসে যে কী করে ছেলেগুলো! পাগল হতে আর দেরি নেই! আরে অই কিশোর, ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে? পেটের খবর আছে, না নেই? খাবি-টাবি না?'

লাঞ্চ! প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। তাই তো! একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। অন্য ছেলেদেরও মনে পড়ল খাওয়ার কথা।

'আসছি, চাচী,' জবাব দিল কিশোর। 'সঙ্গে মেহমান আছে।'

'তখনই তো দেখেছি,' মেরিচাচী বললেন। 'ওকেও নিয়ে আয়। মাংসের বড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

কালো পুরু ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। আঙুল দিয়ে নিজের পেটেই চাঁটি দিল, তবলা বাজাল যেন। কিশোরের হাতে ধরা মাইক্রোফোনের ওপর ঝুঁকে বলল, 'বেড়ে ফেলুন গিয়ে, চাচী! আমরা এই এলাম বলে!'

'পাগল!' মেরিচাচীর সস্নেহ হাসি শোনা গেল।

সবার আগে ঢাকনা তুলে দুই সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল মুসা।

রাশেদ চাচা নেই, কী কাজে বাইরে গেছেন। হাতমুখ ধুয়ে এসে টেবিল ঘিরে বসে পড়ল ছেলেরা। মাংসের বড়া, রুটি, ডিমসেদ্ধ, আর কমলার রস দিয়ে লাঞ্চ সারা হলো।

'কিশোর,' এঁটো প্লেটগুলো সিংকে ফেলতে ফেলতে বললেন মেরিচাচী, 'আমি বাইরে বেরোব। রোভার গেছে তোর চাচার সঙ্গে, আমি বোরিসকে নিয়ে যাচ্ছি। ইয়ার্ডেই থাকিস, আমরা না ফিরলে যাসনে কোথাও।'

'আচ্ছা,' মাথা কাত করল কিশোর।

বেরিয়ে গেলেন মেরিচাচী।

আরেক গেলাস করে কমলার রস ঢেলে নিল ওরা।

'কিশোর,' গেলাসে চুমুক দিয়ে আবার নামিয়ে রাখল মুসা। 'মূর্তিটার ভেতরে কী জিনিস আছে?'

'রক্তচক্ষু।'

'কিন্তু ওই রক্তচক্ষুটা কী?' প্রশ্ন করল রবিন।

'ছোট কোন কিছু,' তার সামনের গেলাসটা আগে পিছে করছে কিশোর। 'নইলে মূর্তির ভেতরে রাখা যেত না। আর এত যত্ন করে যেহেতু লুকানো হয়েছে, নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু। নইলে এত কষ্ট করার কী দরকার ছিল? এখন প্রশ্ন, ওই মূল্যবান জিনিসটা কী? কোন ধরনের রত্ন? যার ঐতিহাসিক মূল্য আছে? তাই হওয়া উচিত। রত্নের নাম রাখার একটা ফ্যাশান ছিল আগে, এই যেমন গ্র্যান্ড মোঘল, স্টার অভ ইনডিয়া, পাশা অভ ইজিপ্ট, রক্তচক্ষুও সে-রকম কিছু। দূর প্রাচ্যের কোন দেশ থেকে হয়তো ওটা কিনেছিলেন মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট, তারপর কোন কারণে লুকিয়ে রেখেছিলেন।'

'হুঁম!' বড় করে শ্বাস ফেলল মুসা। 'তোমার কথা ঠিক হলে...'

'চুপ!' বাধা দিল রবিন। 'লোক আসছে!'

চকচকে একটা সিড্যান গাড়ি, অফিসের বাইরে থামল। ড্রাইভিং সিটে ইউনিফর্ম পরা শোফার। পেছনের দরজা খুলে নামল লম্বা, পাতলা একটা লোক। টেবিলে রাখা অবশিষ্ট পাঁচটা মূর্তির দিকে তাকাল এক পলক।

লোকটার বাঁ হাতে পালিশ করা একটা কালো ছড়ি, অনেক বেতো রোগীর হাতে যেমন থাকে, ভর দিয়ে হাঁটার জন্যে। ছড়ির ডগা দিয়ে আলতো খোঁচা দিল একটা মূর্তিকে, হাত বোলাল ওটার মসৃণ মাথায়। সন্তুষ্ট হতে পারছে না, চেহারাই প্রকাশ করে দিল। আঙুলের ডগায় লেগে যাওয়া ধুলো মুছল রুমালে, তারপর ঘুরল অফিসের দরজার দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর। অন্যেরা যে যার জায়গায় বসে আছে। দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

ধোপদুরস্ত পোশাক পরা ঢেঙা লোকটার চামড়া বাদামী, কুচকুচে কালো চুল ছিল এক সময়, এখন ধূসর। আর কপালে তিনটে কালো ফোঁটা।

'এই যে, ছেলেরা,' চমৎকার ইংরেজি বলে তিন-ফোঁটা। 'মূর্তিগুলো,' ছড়ি তুলে দেখাল সে, চুপ করে গেল কিশোরকে তার কপালের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে।

মাত্র এক মুহূর্ত, তারপরই বদলে গেল কিশোরের চেহারা। ঝুলে পড়ল নীচের ঠোঁট, গাল ফুলে গেল, সামান্য কুঁজো হয়ে গেল পিঠ। 'হ্যাঁ, স্যার, বলুন?' বকের মত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে গলা, আমূল বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। বোকা বোকা একটা ভাব।

'এগুলো ছাড়া আর আছে?' কেমন যেন শীতল কণ্ঠ লোকটার, মনে হয় দূর থেকে আসছে।

'আরও?' বুঝতে পারছে না যেন কিশোর।

'হ্যাঁ, আরও মূর্তি? থাকলে দেখাও। জর্জ ওয়াশিংটন আর বেঞ্জামিন

ফ্রাঙ্কলিনকে দিয়ে চলবে না আমার। অন্য কাউকে দরকার।'

'এই-ই আছে,' কিশোর বলল। 'বাকিগুলো বিক্রি হয়ে গেছে।'

'আরও ছিল তা হলে?' কালো চোখের তারা ক্ষণিকের জন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল লোকটার। 'নাম বলতে পারবে?'

'নাম...নাম!' মনে করার জন্যে চোখ বুজল কিশোর, আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে। চোখ মেলল। 'অদ্ভুত সব নাম! হোম...হোম...হোমার কী যেন! আগাস, হ্যাঁ হ্যাঁ, আগাসটুস জানি কোন জায়গার!'

'ও অমন করছে কেন?' রবিনের কানে কানে বলল মুসা।

'নিশ্চয় কারণ আছে,' ফিসফিস করে জবাব দিল রবিন। 'শোনো।'

'অগাসটাস!' চোখের পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তিন-ফোঁটার গোমড়া মুখ। 'অগাসটাসের একটা মূর্তি আমার দরকার। বাগানের জন্যে। ওটাও বিক্রি হয়ে গেছে?'

'গেছে,' মাথা কাত করল কিশোর।

'লোকটার নাম-ঠিকানা?' আদেশের সুরে বলল ফোঁটা। 'ওর কাছ থেকে কিনে নেব।'

'নাম-ঠিকানা তো লিখে রাখি না!' হাত কচলে বলল কিশোর, যেন মস্ত অন্যায় করে ফেলেছে। 'কে যে নিল...'

'লিখে রাখো না!' কঠিন শোনাল লোকটার গলা। 'এখন থেকে রাখবে। দরকার পড়ে অনেক সময়।'

কিশোরও মনে মনে স্বীকার করল কথাটা।

'দেখো, নাম-ঠিকানা জোগাড় করতে পারো কিনা,' বলল লোকটা। 'একশো ডলার বকশিশ দেব।'

'নাম-ঠিকানা লিখে রাখি না, স্যার,' আবার একই কথা বলল কিশোর। 'তবে, মাঝেসাঝে বাড়ি নেয়ার পর আর জিনিস পছন্দ হয় না কারও কারও, ফেরত নিয়ে আসে। আপনার কপাল ভাল হলে আসতেও পারে অগাসটাস। আপনার ঠিকানা রেখে যান।'

'ভাল বলেছ,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের চেহারায় কী খুঁজল লোকটা 'তা রাখতে পারো।'

ছড়ির এক মাথায় লাগানো ফিতের ফাঁসে বাঁ হাত ঢুকিয়ে দিল তিন-ফোঁটা, কনুইয়ের কাছে এনে ঝুলিয়ে রাখল। পকেট থেকে কার্ড আর কলম বের করে কিছু লিখে কার্ডটা বাড়িয়ে দিল কিশোরকে। 'নাও। এলেই ফোন কোরো। তুমি পাবে একশো ডলার, মূর্তিটার দাম আলাদা। হ্যাঁ, শুধু অগাসটাসের মূর্তি হলেই ফোন কোরো, আর কোনটা দরকার নেই।'

'আচ্ছা, স্যার,' ভোঁতা গলায় বলল কিশোর।

'ভুলে যাবে না তো?'

'মনে রাখার চেষ্টা করব, স্যার।'

'রাখলেই ভাল করবে!' ছড়ির ডগা দিয়ে মাটিতে হঠাৎ খোঁচা মারল

তিনফোঁটা। 'কাগজের টুকরো পড়ে নোংরা হয়ে আছে।'

ছড়ির ডগা কিশোরের দিকে ঠেলে দিল লোকটা।

চেঁচিয়ে উঠল অন্য তিন কিশোর।

ছড়ির আগা থেকে একটা ছুরি বেরিয়ে এসেছে, তাতে গেঁথে রয়েছে কাগজের টুকরোটা। তীক্ষ্ণ ধার, পাতলা ঝকঝকে ছুরির ফলা ফুটখানেক লম্বা, চোখা মাথাটা কিশোরের বুক ছুঁই ছুঁই করছে।

'নোংরামি একদম দেখতে পারি না আমি,' বলল লোকটা, ইঙ্গিতে কাগজের টুকরোটা দেখাল। 'খুলে নিয়ে ঝুড়িতে ফেলো।'

আস্তে হাত বাড়িয়ে ছুরি থেকে কাগজটা খুলে নিল কিশোর।

ছড়ির হাতলের কাছে বোতাম রয়েছে, তাতে চাপ দিল লোকটা, ওর আঙুলের নড়া দেখেই বোঝা গেল। ঝট করে আবার ছড়ির খোঁড়লে ফিরে গেল ফলাটা। নিশ্চয় স্প্রিং-সিসটেমে কাজ করে। আবার সেই নিরীহ চেহারার ছড়ি হয়ে গেল মারাত্মক অস্ত্রটা।

'তা হলে বুঝতেই পারছ,' তীক্ষ্ণ হলো লোকটার গলা, 'ভুললে কী অবস্থা হবে? আমি আবার আসব। অগাসটাসের মূর্তি ফেরত এলেই ফোন করবে আমাকে।'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। টেবিলে রাখা পাঁচটা মূর্তির দিকে আরেকবার ফিরে চাইল, তারপর গটমট করে উঠল গাড়িতে।

চলে গেল চকচকে সিডান।

ছয়

গেট দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘুরল কিশোর। চেহারা ফেকাসে। হাতের কাগজটাকে দলা পাকিয়ে মুঠো করে রেখেছে।

'ওই লোকের সঙ্গে চালাকি চলবে না!' বলে উঠল মুসা। 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে পেটে!'

'আমাকে হুমকি দিয়ে গেল!' ঢোক গিলল কিশোর। দরজা দিয়ে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। 'সত্যিই বলেছ, ওর সঙ্গে চালাকি চলবে না। বুঝিয়ে দিয়ে গেল।'

'মনে হচ্ছে, এই লোকই দশ বছর আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিল,' অগাস্ট বলল। 'শিওর না, তবে ওই লোকটার মতই লাগল একে।'

'তোমাদের বাড়িতে যে এসেছিল, তার কপালেও তিনটে ফোঁটা ছিল,' রবিন বলল। 'এই লোকটাকেও দূর প্রাচ্যের লোক মনে হলো। হয়তো ভারতের কোন অঞ্চল থেকে এসেছে, কপালের ফোঁটা তিনটে হয়তো কোন গোত্র বা ধর্মের প্রতীক চিহ্ন।'

'কেন ওকে বললে অগাসটাসের মূর্তিটার কথা?' কিশোরের দিকে চেয়ে অনুযোগ করল মুসা। 'কাজটা বোধহয় ভাল হলো না!'

'না বললে বিপদে পড়তাম,' কিশোর চিন্তিত। গেলাস তুলে ঢকঢক করে গিলল

কমলার রস, ভিজিয়ে নিল শুকনো গলা। 'ও জেনেশুনেই এসেছে। সেটাই শিওর হয়ে নিলাম বলে দিয়ে। উকিল রয় হ্যামারের ফাইল থেকে চিঠির কপিও হয়তো ও-ই সরিয়েছে।

'কিন্তু ওর চশমাও নেই, কালো গোঁফও নেই,' মনে করিয়ে দিল অগাস্ট।

'কাগজ চুরি করার জন্যে লোক ভাড়া করতে পারে,' রবিন বলল। 'যেভাবে যা-ই করুক, অগাসটাস ওর কাছে মূল্যবান। তারমানে, জানে।'

'এখানে তথ্যের জন্যে এসেছিল,' কিশোর বলল। 'আমারও তথ্য দরকার। ও তেমন কিছু জেনে যেতে পারেনি, কিন্তু আমি জেনে নিয়েছি। লোকটার নাম-ঠিকানা রেখে দিয়েছি!'

তিন-ফোঁটার দেয়া কার্ডটা রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। সবাই ঝুঁকে এল, কী লেখা আছে দেখতে। ছাপানো রয়েছে:

কালিচরণ রামানাথ

কাটিরঙ্গা, ভারত।

অদ্ভুত ঠিকানা! কাটিরঙ্গার কোথায় থাকে, কী করে, কিছুই লেখা নেই। তার নীচে কলম দিয়ে লিখেছে হলিউডের একটা হোটেলের নাম আর ফোন নম্বর।

'ভারত!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'রবিন ঠিকই বলেছে! কোন খুনে গোত্রের লোক নয় তো তিন-ফোঁটা! তা হলে রক্তচক্ষু খোঁজায় ইস্তফা! শুনেছি, আফ্রিকার চেয়েও খারাপ জায়গা ভারত। ওখানে নানারকম হিংস্র উপজাতির বাস, ধর্মের জন্যে মানুষ বলি দেয় যখন-তখন! দৃষ্টি দিয়েই তোমাকে ভস্ম করে দিতে পারে পুরোহিতরা, গলা কেটে মুণ্ডু আলাদা করে...'

'আরে দূর, কী যা-তা বলছ!' বাধা দিল কিশোর। 'ওসব বাজে কথা, লোকের বানানো গপ্পো।' রবিনকে বলল, 'তোমার কিছু কাজ বাড়ল, নথি।'

'তাই তো চাই,' রবিন বলল। 'কী কাজ?'

'রক্তচক্ষুর ব্যাপারে খোঁজ নেবে। লাইব্রেরিতে কোন বইয়ে দেখো তো, ওটার উল্লেখ আছে কিনা। আমার মনে হয় রত্ন কিংবা মূল্যবান পাথরের ওপর লেখা রেফারেন্স বইয়ে পেয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে,' মাথা নাড়ল রবিন। 'তো এখন যাই। লাইব্রেরিতে যাব আগে। ওখানে কাজ সেরে বাড়ি ফিরব।'

'যাও। ভূত-থেকে-ভূতে চালু করে দিয়ো ডিনারের আগেই।'

সাইকেল নিয়ে চলে গেল রবিন।

'বরং বাদই দাও!' হঠাৎ বলল অগাস্ট। 'তোমাদেরকে কতখানি বিপদে ফেলছি, আমিও জানি না! অবস্থা বিশেষ ভাল ঠেকছে না! রয় হ্যামারের বাড়িতে ডাকাত পড়ল, তিন-ফোঁটা এসে তোমাকে হুমকি দিয়ে গেল। কিশোর, সামনে মহাবিপদ! তোমাদেরকে বিপদে ফেলার কোন যুক্তিই নেই, রক্তচক্ষুর কথা ভুলে বরং বাড়ি ফিরে যাই আমি। অগাসটাসকে খোঁজার দরকার নেই তোমাদের। পারলে তিন-ফোঁটা কিংবা কালো-গোঁফোই খুঁজে নিক, ওটা নিয়ে মারামারি করুকগে ওরা।'

'খুব ভাল কথা বলেছ,' সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল মুসা। 'কী বলো, কিশোর?'

কিন্তু গোয়েন্দাপ্রধানের চেহারা দেখেই জবাব পেয়ে গেল সে। জটিল রহস্য সমাধান করতে দেয়া হয়েছে কিশোর পাশাকে, রক্তের গন্ধ পেয়েছে ব্লাডহাউন্ড, আর তাকে বিরত করা যাবে না।

'মাত্র তো শুরু করলাম, সেকেন্ড,' কিশোর বলল, 'এখনি কী! রহস্যই তো চাই আমরা, পেয়েছিও, এখন সেটার কিনারা না করেই পিছিয়ে যাব? কাজের কথায় আসি। কয়েকটা ব্যাপার অদ্ভুত ঠেকছে!'

'যেমন?'

'আলমারিতে নিজেই নিজেকে আটকে রেখেছিল রয় হ্যামার,' বোমা ফাটাল কিশোর।

বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না অগাস্ট। 'আটকে রেখেছিল! কেন?'

'সেটাই বুঝতে পারছি না।'

আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে মুসা। 'আলমারিতে কী করে আটকা পড়ল নিজে নিজে? চেহারা দেখে মনে হয়েছে, ঝড়ে পড়েছিল, ওই অবস্থাই বা করল কী করে নিজের?'

'দেখে যা মনে হয়, তাই হতে হবে এমন কোন কথা নেই,' এক আঙুল দিয়ে গাল চুলকাল কিশোর। 'ভাবো। নিজের মগজকে কাজে লাগাও।...উকিল বলেছে, দেড় ঘণ্টা ধরে আলমারিতে আটকে আছে, বলেনি?'

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ।'

'বেশ। তা হলে তার কথামত, সে ওই দেড়টি ঘণ্টা খানিক পর পরই চেঁচিয়েছে, দরজায় ধাক্কা দিয়েছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু ওই রকম পরিস্থিতিতে একজন মানুষ সাধারণত কী করবে প্রথমে?'

'প্রথমেই চশমা ঠিক করবে!' চেঁচিয়ে উঠল অগাস্ট। 'হয় নাকে বসাবে, কিংবা খুলে পকেটে রেখে দেবে। অন্ধকারে পকেটেই রাখে বেশিরভাগ লোকে। সুতো বেঁধে কান থেকে দেড় ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা...উঁহু! অসম্ভব!'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা চুলকাল মুসা। 'আরও একটা ব্যাপার, চশমা ঠিক করার পরেই টাই ঠিক করত। টেনেটুনে নট ঢিলা করত, সোজা করত টাইটা, যেভাবে বাঁকা হয়েছিল খুব অস্বস্তি লাগার কথা। কিশোর, ঠিকই আন্দাজ করেছ। ওই ব্যাটা চশমা আর টাই উল্টোপাল্টা করে রেখেছিল ইচ্ছে করেই, আমাদের বোকা বানানোর জন্যে।'

'রহস্যের সমাধান করতে হলে সমস্ত ব্যাপার খতিয়ে দেখতে হবে, খুঁটিনাটি কিছু বাদ দেয়া চলবে না, কিশোর বলল। 'তোমাদের মতই আমিও প্রথমে বোকা বনেছিলাম।...এসো, এখানে এসো। দুজনেই।' চেয়ার থেকে উঠে সরে দাঁড়াল সে। 'চেয়ারের গদিতে হাত দিয়ে দেখো। টেবিলেও হাত রাখো।'

কিশোর যে চেয়ারটায় বসেছিল, তার গদিতে হাত রেখে দেখল মুসা আর অগাস্ট। চেয়ারের সামনে টেবিলেরও খানিকটা জায়গায় হাত বোলাল।

'কী বুঝলে?' ভুরু নাচাল গোয়েন্দাপ্রধান।

'চেয়ারের গদি গরম,' বলল অগাস্ট। 'টেবিলও।'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। রয় হ্যামারের চেয়ার তুলতে গিয়েও এই একই ব্যাপার দেখেছি। চেয়ারের গদি গরম, বড়জোর মিনিট খানেক আগে ওতে বসেছিল কেউ। এরপর যখন ওর চশমা আর টাইয়ের কথা ভাবলাম, আর কোন সন্দেহ রইল না। বুঝে গেলাম কী ঘটেছে।

'আমাদেরকে আসতে দেখেছে সে, গাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছে। তাড়াতাড়ি চেয়ারটা উল্টে রেখে গিয়ে আলমারিতে ঢুকছে, চশমা আর টাই উল্টোপাল্টা করেছে। আমরা তার ঘরে ঢুকেছি, সাড়া পেয়েই শুরু করেছে চেঁচামেচি। দু'তিন মিনিটের বেশি আলমারিতে ছিল না সে।'

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ও-কাজ করতে গেল কেন?'

'আমাদেরকে বিপথে নেয়ার জন্যে,' কিশোর বলল। 'বোঝানোর জন্যে, চিঠির কপি সত্যিই চুরি গেছে। আসলে মিছে কথা বলেছে।'

'তারমানে, চশমাধারী, কালো গোঁফওয়ালা, মাঝারি উচ্চতার কোন লোক নেই?' অগাস্টের প্রশ্ন।

'আমার তো তাই মনে হয়। সব হ্যামারের বানানো কথা। যা মনে হচ্ছে, তিন-ফোঁটা কালিচরণ রামানাথের টাকা খেয়েছে সে, কপিটা দিয়ে দিয়েছে তাকে। আমাদেরকে কী করে বোকা বানাবে, সেটাও হাতুড়ি মিয়ারই পরিকল্পিত।'

'হাতুড়ি মিয়া!' বুঝতে পারছে না অগাস্ট।

'হ্যামারের বাংলা হাতুড়ি, কাউকে সম্বোধন করতে মিয়া বলে আমাদের দেশে, অনেক ক্ষেত্রে টিটকারির ছলে।'

'অ। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ওই হাতুড়ি মিয়ারই যত শয়তানী। হুঁ, এখন বোঝা যাচ্ছে, তিন-ফোঁটা কার কাছে খবর পেল এখানে মূর্তিগুলো আছে। চিঠি পড়েই বুঝেছে সে, অগাসটাসের মূর্তির ভেতর রয়েছে জিনিসটা।'

'ব্যাটা আবার আসবে বলে গেছে!' মুসা বলল। 'সঙ্গে করে না আরও কয়েকটা কয়েক-ফোঁটাকে নিয়ে আসে! যদি বিশ্বাস না করে আমাদের কথা? যদি ভাবে, অগাসটাসের মূর্তি কোথায় আছে আমরা জানি, তাকে মিছে কথা বলছি? শুনেছি, ভারতের লোকেরা নাকি কথা আদায়ের জন্যে খুব অত্যাচার করে মানুষের ওপর!'

'দেখো, অত্যাচার সব দেশেই আছে। আমেরিকানরা কম অত্যাচার করেছিল চীনাদের ওপর? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নাৎসী আর জাপানীরা কী করেছে? আজও ইহুদীরা যে অত্যাচার চালাচ্ছে প্যালেসটাইনীদের ওপর, ভাবতেই গা শিউরে ওঠে! আর ইংরেজরা কী করেছিল?' অগাস্টের ওপর চোখ পড়তেই থেমে গেল কিশোর। 'গাস, কিছু মনে কোরো না, আমি ইতিহাসের কথা বলছি। ভারত দখল করেছিল ওরা জোর করে, দু'শো বছর ধরে একটানা অকথ্য অত্যাচার, অনাচার চালিয়েছে, বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছিল লর্ড ক্লাইভ আর তার চেলারা, ওদের তুলনায় ভারতের মানুষ ফেরেশতা...'

'হয়েছে, হয়েছে কিশোর, থামো!' দু'হাত তুলল মুসা। 'আমি মাপ চাইছি!'

'সরি!' লজ্জিত হলো কিশোর। 'উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। ইনডিয়াকে কেউ খারাপ বললে সইতে পারি না। ওটা আমার দেশ...'

'বাংলাদেশ না?' অগাস্ট প্রশ্ন করল।

'বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান আগে একটাই দেশ ছিল, ক্লাইভের চেলাদের কাছে "ব্লাডি ইনডিয়া", ওরাই ভাঙনের বীজ বুনে এসেছে, ভাগাভাগি করে দিয়ে এসেছে একটা অখণ্ড সোনার দেশকে।...যাকগে, ওসব পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। সব দেশেই ভালমন্দ আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম...ফোন বেজে উঠল, বাধা পড়ল তার কথায়।

উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। 'হ্যাল্লো। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড।'

'মিসেস প্যাশা আছেন?' মহিলাকণ্ঠ ভেসে এল। 'আমি মালিবু বীচ থেকে বলছি। মিসেস হ্যামলিন।'

'তিনি তো নেই, বাইরে গেছেন। জরুরী কিছু? আমাকে বলবেন? চাচী এলেই বলব।'

'ও, তোমার চাচী? গুড। কী নাম তোমার, খোকা?'

'কিশোর পাশা। কিশোর।'

'হ্যাঁ, কিশোর, গতকাল দুটো মূর্তি কিনেছিলাম তোমাদের ওখান থেকে। বাগানে সাজাব বলে।'

'সাজিয়েছেন?' সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর।

'না, পারলাম আর কই? ধুলোময়লা খুব বেশি ছিল, বাগানে ফেলে পাইপের পানি দিয়ে ধুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একেবারে নরম কাদা দিয়ে তৈরি। পয়লা চোটেই কান খসে গেল, তারপর চলটা উঠতে শুরু করল, ওগুলো ঘরে রাখার জিনিস, বাগানে বৃষ্টিতে চব্বিশ ঘণ্টাও টিকবে না। ভাবছি, ফেরত নেবে কিনা! বাগানে তো সাজাতে পারলাম না, তোমার চাচী অবশ্য তাই বলেছিল...'

'সরি, মিসেস হ্যামলিন, আমরা জানতাম না ওগুলো মাটির। পুরানো জিনিস কিনি তো, কোনটা যে খারাপ পড়বে, ঠিক বোঝা যায় না। আপনি মূর্তি পাঠিয়ে দিন, পয়সা ফেরত নিয়ে যাবে। আচ্ছা, কার মূর্তি নিয়েছিলেন?'

'কার মূর্তি মানে?'

'মূর্তিগুলো তো সব বিখ্যাত লোকের, নামটা জানতে চাইছি।'

'অ। তা ঠিক বলতে পারব না। তবে পোল্যান্ড নামটা মনে আছে, পোল্যান্ডের কী যেন?'

'অগাসটাস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অগাসটার অভ পোল্যান্ড। আজব নাম! তা মূর্তিগুলো পাঠিয়ে দিতে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। কাল আমিই নিয়ে আসব।'

'আপনি আর কেন কষ্ট করবেন?' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'আমরাই বরং আসি, দোষটা তো আমাদেরই, টাকা ফেরত দিয়ে মূর্তি নিয়ে আসব। আজ

বিকেলেই আসি?'

'তা হলে তো খুবই ভাল হয়।'

'ঠিকানাটা দিন।'

ঠিকানা লিখে নিয়ে মিসেস হ্যামলিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। ফিরে তাকাল।

কৌতূহলে ফেটে পড়ছে মুসা আর অগাস্ট। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'অগাসটাস অভ পোল্যান্ডকে পাওয়া গেছে, হাসল কিশোর। 'বোরিস ফিরে এলেই যাব। নিয়ে আসব মূর্তিটা!'

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'তিন-ফোঁটার কাছ থেকে খবরটা গোপন রেখো, আল্লাহ্!'

মুসার কথার ধরনে হেসে ফেলল কিশোর আর অগাস্ট।

সাত

রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্ট-টাইম চাকরি করে রবিন, হাত খরচের টাকাটা এসে যায়, মা-বাবার কাছে চাইতে হয় না, তা ছাড়া, পছন্দসই জিনিস কেনার ব্যাপারও আছে। তবে সবচেয়ে বড় সুবিধে, ইচ্ছেমত যখন-তখন এসে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা যায়, লাইব্রেরিয়ানের অনুমতি নিয়ে বাড়ি, নিয়ে যাওয়া যায়, এখানে চাকরি না করলে এই সুবিধেটা পেত না।

অসময়ে রবিনকে লাইব্রেরিতে ঢুকতে দেখে অবাক হলেন না প্রৌঢ়া লাইব্রেরিয়ান মিস হকিনস। তবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আরে, রবিন? আজ তো তোমার ডিউটি নেই।'

'একটা তথ্য দরকার, আপা,' রবিন বলল। 'কয়েকটা বই দেখব।'

'আ, তাই বলি, অসময়ে আমাদের ছোট গোয়েন্দা এখানে কেন?' মিষ্টি করে হাসলেন মিস হকিনস। 'এসে ভালই করেছ, রবিন। আজ যা কাজ না! একটু সাহায্য করবে? না না, বেশি কিছু না, এই কয়েকটা বই একটু র‍্যাকে তুলে দেবে। পারবে?'

'নিশ্চয়, দিন,' এগিয়ে এল রবিন।

বইগুলোর অবস্থা দেখে পাঠকদের ওপর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রবিনের, এত অযত্ন করে! কোনটার মলাট ছিঁড়ে ফেলেছে, কোনটা সেলাই ছিঁড়ে যাওয়ায় ভেতরের পাতা বেরিয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় এগুলো র‍্যাকে তোলা উচিত হবে না, এরপর টানাটানিতে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। বেশি ছেঁড়া বইগুলো তুলে নিয়ে হলের পেছনের ছোট একটা ঘরে চলে এল। সুচ-সুতো-ছুরি-কাঁচি-আঠা, সবই আছে এখানে। কাজে লেগে গেল সে। সেলাই করে, আঠা লাগিয়ে, মলাট জুড়ে দিয়ে আবার প্রায় নতুন করে ফেলল সে বইগুলোকে, গভীর মমতায় একবার হাত বোলাল ওগুলোর ওপর, তারপর এনে সাজিয়ে রাখতে লাগল র‍্যাকে।

বাকি বইগুলো নিয়ে এল রবিন। স্তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা

মোটা বই, নতুনই রয়েছে মলাট। নামটা দেখে চমকে উঠল। সে. ফেমাস জেমস অ্যান্ড দেয়ার স্টোরিজ। ঠিক এই ধরনের একটা বই-ই মনে মনে খুঁজছিল সে।

রবিনের চমকে ওঠা লক্ষ্য করলেন মিস হকিনস। 'কী ব্যাপার, রবিন?'

আনমনেই মাথা নাড়ল রবিন। বইটা তুলে নিয়ে এল মহিলার কাছে। 'এটার জন্যেই এসেছিলাম। টেবিলে পড়ে আছে!'

'আরে!' মিস হকিনসও চোখ কপালে তুললেন। 'আশ্চর্য! কয়েক বছর ধরে র‍্যাকে পড়ে আছে ওটা, ছুঁয়েও দেখে না কেউ! আজ একই দিনে দু'জনের দরকার পড়ল!'

'কে পড়ছিল, মনে আছে?'

'না। আজ এমনিতেই ভিড় বেশি, তা ছাড়া কোন্ টেবিলে কে কী পড়ছে, এখানে বসে কী করে জানব!'

বোকার মত প্রশ্ন করে বসেছে সে—ভাবল রবিন। কে হতে পারে?

'আচ্ছা, লোকটার কি কালো গোঁফ ছিল?' আবার জিজ্ঞেস করল সে। 'চোখে হর্ন-রিমড চশমা? এই মাঝারি উচ্চতা...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরকম একটা লোক এসেছিল বটে,' মাথা ঝাঁকালেন মিস হকিনস। 'তবে ও-ই এই বই পড়েছে কিনা...না না, ঠিক, ও-ই পড়েছে! আমাকে এ-ধরনের বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ফ্যাসফ্যাসে গলা, সে-জন্যেই মনে করতে পেরেছি। চেনো নাকি ওকে?'

'না, শুনেছি।' বাকি বইগুলো র‍্যাকে তুলতে চলল সে। মনে ভাবনার ঝড়। কালো-গুঁফো এই বই পড়ছিল কেন? কী জানতে চেয়েছিল? লোকটা কে?

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বইটা নিয়ে এসে কোণের দিকে প্রায় নির্জন একটা টেবিলে বসল রবিন।

গভীর আগ্রহে বইয়ের বিশেষ বিশেষ জায়গা পড়ে চলল সে। পৃথিবীর বিখ্যাত সব রত্ন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর ইতিহাস, বিভিন্ন তথ্য। যেটাই ধরছে, ছাড়তে পারছে না। জোর করে শেষে 'হোপ' হীরার অধ্যায়, থেকে চোখ সরাল, পাতা উল্টে চলল। হঠাৎ করেই পেয়ে গেল রক্তচক্ষু, পুরো একটা অধ্যায় লেখা রয়েছে ওটার ওপর।

পায়রার ডিমের সমান একটা পদ্মরাগমণি। কখন, কোথায়, কীভাবে আবিষ্কার হয়েছে ওটা, কেউ জানে না। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে পাথরটার নাম জানে চীন, ভারত আর তিব্বতের মানুষ। রাজা-মহারাজা, সম্রাট, রানী, রাজকুমারী, বড় বড় সওদাগর, অনেকেই এর মালিক হয়েছে, কিন্তু কেউ ধরে রাখতে পারেনি বেশিদিন। কারও কাছ থেকে চুরি হয়েছে, কারও কাছ থেকে ছিনতাই, বেশ কয়েকজন খুনও হয়েছে ওটার জন্যে। শুধু তাই নয়, রাজায় রাজায় লড়াই বাধিয়েছে ওই চুনি, সিংহাসন ছাড়া করেছে রাজাকে, কাঙাল বানিয়ে বনবাসে পাঠিয়েছে। অন্তত পনেরো জনের রহস্যময় মৃত্যু ঘটেছে ওই পাথরের জন্যে।

মহামূল্যবান রক্তচক্ষু, অদ্ভুত নামকরণের কারণ, দেখতে ওটা মানুষের চোখের মত, রঙ রক্তলাল। মহামূল্যবান কেন হলো ওটা, জানা যায়নি, বরং উল্টোটাই

হওয়ার কথা। রক্তচক্ষু নিরেট নয়, মস্ত খুঁত আছে, ভেতরটা ফাঁপা। তবু এর জন্যে পাগল মানুষ! কেন!

পড়তে পড়তে অধ্যায়ের শেষে চলে এল রবিন। লেখা রয়েছে:

'মূল্যবান অনেক পাথরই আছে, যেগুলো অভিশপ্ত, দুর্ভাগ্য বয়ে আনে মালিকের। বারবার হাত বদল হয়েছে ওগুলো, কেউ মরেছে, কেউ সাংঘাতিক অসুখে ভুগেছে ওগুলোর জন্যে, কারও বা অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ওগুলোর মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে কেউই নিরাপদ ছিল না। হোপ হীরা তেমন পাথরের একটা, মানুষের ক্ষতি করেই চলছিল, শেষে ভয়ে ওটাকে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটকে দান করে দিয়ে বাঁচল ওটার শেষ মালিক। রক্তচক্ষু ওরকম আরেকটা অভিশপ্ত পাথর। ওটার মালিক হয়ে দুর্ভাগ্যের কবল থেকে বেঁচেছে খুব কম লোকেই। শেষে ওটাকে ভারতের এক মহারাজ দান করে দিলেন ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম কাটিরঙ্গার "ন্যায়-বিচারের মন্দির"-এ (গ্রাম এবং মন্দিরের নামের ব্যাপারে মতান্তর আছে)।

'মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিয়োজিত রয়েছে একদল দুর্ধর্ষ পাহাড়ী উপজাতির লোক, ভয়ানক যোদ্ধা ওরা। দেব-মূর্তির কপালে খোচিত ছিল রক্তচক্ষু। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, পাপীকে ধরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আছে পাথরটার। কাউকে দোষী সন্দেহ হলে, তাকে নিয়ে আসা হত রক্তচক্ষুর সামনে। যাকে আনা হলো, সে পাপী হলে, জ্বলে উঠবে পাথরটা।

'অনেক বছর আগে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় রক্তচক্ষু। এখন কোথায় আছে, কেউ জানে না, অথচ আজও এর আশা ছাড়েনি মন্দিরের লোক, দুনিয়াময় খুঁজে বেড়াচ্ছে পাথরটা। গুজব রয়েছে, মন্দিরেরই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে পাথরটা বিক্রি করে দিয়েছে বিদেশী কারও কাছে। কেউ বলে পাথরটা এখন অপঘাতে মরা চোরের কবরে পড়ে রয়েছে, তার শুকনো হাড়গোড়ের মাঝে। কেউ বলে, না, কবরে নেই, অন্য জায়গায়, আবার একদিন উদয় হবে। পুরানো কিংবদন্তী বলে: পঞ্চাশ বছর মানুষের ছোঁয়া না পেলে রক্তচক্ষুর ক্ষতি করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে, অভিশাপ মুক্ত হয়ে যাবে, তখন কেউ ওটা খুঁজে বের করতে পারলে, উপহার পেলে, কিংবা ন্যায্য দামে কিনে নিলে তার আর ক্ষতি হবে না। তবে, চুরি কিংবা ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া চলবে না, তা হলে যে নেবে তার ক্ষতি হবেই।

'কিছু রত্ন-সংগ্রাহক গোপনে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে পাথরটা। অভিশপ্ত হোক বা না হোক, পাথরটা তাদের চাই-ই। তবে ক্ষীণ একটা আশাও রয়েছে ওদের, হয়তো পঞ্চাশ বছরে শুদ্ধ হয়ে গেছে রক্তচক্ষু।'

'বাপরে!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। ওই পাথরের কাছ থেকে দূরে থাকাই উচিত!–মনে মনে বলল। কী ভেবে পাতা উল্টে বইটা কবে লেখা হয়েছে, দেখে নিল। বেশ কয়েক বছর আগের ছাপা। কয়েকটা প্রশ্ন ভিড় জমাল মনে। কতদিন আগে চুরি হয়েছে রক্তচক্ষু? সত্যিই ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে পাথরের? তা যদি হয়, পঞ্চাশ বছর পর কি আসলেই শুদ্ধ হয়ে যাবে রক্তচক্ষু।

চিন্তিত ভাবে বইটা নিয়ে র‍্যাকে রেখে দিল রবিন। একটা এনসাইক্লোপিডিয়া

খুলে খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেল কাটিরঙ্গা, কয়েক লাইন লেখা রয়েছে জায়গাটার ওপর। পাহাড়ঘেরা খুব দুর্গম অঞ্চল, অধিবাসীরা ভয়ংকর প্রতিহিংসাপরায়ণ।

ঢোক গিলল রবিন নিজের অজান্তেই, গলা শুকনো। রক্তচক্ষু আর কাটিরঙ্গার ব্যাপারে যা যা জেনেছে, নোট লিখে নিল। ভাবছে। কিশোরকে ফোন করে জানাবে? না, তত তাড়াহুড়ো নেই। পরে জানালেও চলবে। তা ছাড়া ডিনারের সময় হয়ে এসেছে। বাড়িতে বলে আসেনি, দেরি করলে মা বকবেন!

মিস হকিনসকে 'গুড-বাই' জানিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। বাড়িতে পৌঁছে দেখল, ডিনার তৈরি করছেন মা, বাবা বসে বই পড়ছেন, মুখে পাইপ।

ছেলের সাড়া পেয়েই মুখ তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এই যে, এসেছ। ভাবছ কী? মনে হচ্ছে, মস্ত কোন সমস্যায় পড়ে গেছ?'

'বাবা,' এগিয়ে এল রবিন, 'অগাসটাস অভ পোল্যান্ডের নাম শুনেছ? কে ছিলেন, জানো?'

'না,' মাথা নাড়লেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'অগাসটাস... অগাসটাস...অগাস্ট, হ্যাঁ, অগাস্ট নামটা জানি। কী করে হয়েছে, তা-ও জানি। তুমি জানো?'

রবিন জানে না। খুলে বললেন তাকে মিস্টার মিলফোর্ড। গায়ে পিন ফোটাল যেন কেউ, এমনিভাবে লাফিয়ে উঠল রবিন। প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল ফোনের কাছে।

কিন্তু কিশোরকে পাওয়া গেল না, জানালেন মেরিচাচী। আধ ঘণ্টা আগে বোরিস আর মুসাকে নিয়ে মালিবু বীচে গেছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

'আমি আসছি,' রবিন বলল। 'এলে ওকে বলবেন। থ্যাংক ইউ,' ফোন রেখে দিল সে।

দরজার দিকে আবার রওনা দিতে যাবে, এই সময় মায়ের ডাক কানে এল। 'এই, তোমরা খেতে এসো, আমার হয়ে গেছে।'

বাধ্য হয়েই আবার ফিরতে হলো রবিনকে। বাবার কাছ থেকে যা জেনেছে, কিশোরকে জানানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে গলায় বার বার খাবার আটকে যেতে লাগল তার।

মিসেস হ্যামলিনের বাড়ি খুঁজছে তখন কিশোর, মুসা আর অগাস্ট।

অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল। বড় বাংলো টাইপের বাড়ি, চারপাশ ঘিরে রেখেছে বাগান।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল তিন কিশোর। লাল ইঁটের পথ চলে গেছে সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগানের মাঝখান দিয়ে। বাড়ির দরজায় এসে বেল বাজাল কিশোর।

সুন্দর চেহারার একজন মাঝবয়েসী মহিলা দরজা খুলে দিলেন, পরনে হালকা পোশাক।

'আমি কিশোর পাশা, স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে এসেছি,' পরিচয় দিল কিশোর। 'মূর্তিগুলো কোথায়?'

'ও, এসো এসো, ওই যে ওখানে।'

গলা শুনেই বুঝল কিশোর, মিসেস হ্যামলিন।

পথ দেখিয়ে বাগানের কোণে এক জায়গায় ওদেরকে নিয়ে এলেন মহিলা। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যেন পড়ে আছে অগাসটাস অভ পোল্যান্ড, করুণ অবস্থা। নাক নেই, একটা কান খসে গেছে, শরীরের জায়গায় জায়গায় খাবলা দিয়ে ছাল-চামড়া-মাংস তুলে নেয়া হয়েছে যেন। কিন্তু ফ্র্যানসিস বেকন বহাল তবিয়তেই রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে, ওটাকে ধোয়া হয়নি, ধুলো জমে রয়েছে গায়ে আগের মতই।

'ফিরিয়ে দিতে খারাপই লাগছে,' মহিলা আন্তরিক দুঃখিত, 'খুব শখ করে এনেছিলাম। আসলে, বাগানে বসানোর জিনিস নয় এগুলো, ঘরে রাখার জন্যে বানিয়েছে। পানি লাগলেই শেষ।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভাববেন না,' আশ্বাস দিল কিশোর, 'ইয়ার্ডে প্রায়ই পুরানো মাল আসে। আপনার কথা মনে রাখব। বাগানে সাজানোর উপযুক্ত পাথরের তেমন মূর্তি এলেই দিয়ে যাব আপনাকে,' অগাসটাসকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি সে। 'এই যে নিন, আপনার টাকা। নিয়ে যাই তা হলে মূর্তি দুটো?'

টাকাটা নিলেন মিস হ্যামলিন, গুণে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না, সায় জানিয়ে মাথা কাত করলেন।

দু'হাতে মূর্তিটাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে এগোল কিশোর, ভারের জন্যে তার শরীর বাঁকা হয়ে গেছে পেছন দিকে। মুসা তুলে নিল বেকনকে।

সাবধানে গাড়িতে মূর্তিদুটো নামিয়ে রাখল মুসা আর কিশোর। হাঁপাচ্ছে।

'আরিব্বাপরে!' ফোঁস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল মুসা। 'কী ভারির ভারি!'

অগাস্ট বসল পিকআপের কেবিনে, তার আর বোরিসের মাঝখানে সিটে রয়েছে মূর্তিদুটো। মুসা আর কিশোর উঠল পেছনে। গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস।

'তা হলে রক্তচক্ষুকে পেলাম?' বলল মুসা। 'তুমি এখনও শিওর, অগাসটাসের ভেতরেই পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ইয়ার্ডে ফিরেই আগে ভাঙতে হবে মূর্তিটা, না কী বলো?'

'রবিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। নইলে মন খারাপ হবে ওর।'

ইয়ার্ডের অফিসে মেরিচাচীর সঙ্গে বসে কিশোরদের অপেক্ষা করছে রবিন। সময় যেন দাঁড়িয়ে গেছে মনে হচ্ছে তার। ইতিমধ্যে দু'জন খরিদ্দার এসেছে, ছোটখাট জিনিস কিনেই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে আবার।

গেটে গাড়ির শব্দ হতেই ঝট করে ফিরল রবিন। নিরাশ হলো। না, পিকআপ নয়, কালো একটা সিডান ঢুকছে। আরে, সিডানের জোয়ার এল নাকি! আর কোন গাড়ি আসতে পারে না। অফিসের সামনে এসে থামল গাড়িটা। একজন লোক নামল। দেখেই চমকে উঠল রবিন। মাঝারি উচ্চতা, কালো চুল, হর্ন-রিমড চশমা, আর অবশ্যই কালো গোঁফ!

কালো গুঁফো! এখানে!

'গুড ইভনিং,' অফিসের দরজা থেকেই বলল লোকটা, মেরিচাচীর দিকে তাকিয়ে, ফ্যাসফেঁসে গলা। অফিসের বাইরে টেবিলে রাখা পাঁচটা মূর্তির দিকে

আঙুল তুলল। 'খুব ভাল জিনিস। বিখ্যাত সব লোক! আর আছে, না এই কটাই?'

'এই কটাই,' মেরিচাচী বললেন। একটা কথা আগেই বলে দিচ্ছি, 'বাগানে বসানোর জন্যে নেবেন না। পানি লাগলেই নষ্ট হয়ে যায়, এই একটু আগে একজন অভিযোগ করেছে। ওগুলো ফেরত আনতে পাঠিয়েছি। মনে হয়, বাকিগুলোর ব্যাপারেও অভিযোগ আসবে শিগগিরই।'

মেরিচাচীর কণ্ঠ আর চেহারা দেখেই বুঝল রবিন, বেচারীর মন খারাপ। জিনিস বিক্রি করে আবার ফেরত নেয়া যে কোন ব্যবসায়ীর জন্যে কষ্টকর। তা ছাড়া পুরানো জিনিস, খারাপ বলে ফেরত দিচ্ছে লোকে, এরপর বিক্রি হবে কিনা, তার ঠিক নেই। অনেকগুলো টাকা পানিতে যাবে, মেরিচাচীর খারাপ লাগারই কথা।

'তাই?' আগ্রহী মনে হলো কালো-গুঁফোকে। 'দুটো আসছে, বাকিগুলোও আসতে পারে বলছেন? তা হলে তো খুব ভাল। এসব জিনিস সংগ্রহ করা আমার নেশা, এই পাঁচটা নিচ্ছি, বাকিগুলোও নেব, যদি আসে। আর কাউকে দেবেন না, প্লীজ!'

'দাম জানেন?' মেরিচাচী বললেন।

'কত?'

'পঞ্চাশ ডলার করে একেকটা।'

'রাজি।'

'যেগুলো ফেরত আসবে, ওগুলোর অবস্থা কেমন থাকবে জানি না। ভেঙে চুরে নষ্ট হয়ে আসতে পারে।'

'কুছ পরোয়া নেই। আমি নেব,' বলতে বলতেই পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করল। সাড়ে তিনশো ডলার গুণে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। সাতটার দাম। এখানে পাঁচটা, আর যে দুটো আসছে তার জন্যে।'

'অবাক হয়েছেন মেরিচাচী। বোকা নাকি লোকটা! টাকাগুলো নিতে দ্বিধা করছেন। শেষে বললেন, 'আগেই বলে দিচ্ছি, খারাপ জিনিস। পরে আমাকে দুষবেন না, ফেরত নিয়ে আসতে পারবেন না।'

'আনব না, নিন, টাকা নিন। যেগুলো ফেরত আসবে, সব নেব। আর কাউকে দেবেন না।'

টাকাগুলো নিয়ে ড্রয়ারে রাখতে রাখতে বললেন চাচী, 'দেব না। বসুন, অন্য দুটো এসে পড়ল বলে। আমার ছেলে গেছে আনতে।' বাইরের লোকের কাছে কিশোরকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দেন মেরিচাচী।

'গুড!' একটা চেয়ার টেনে বসল লোকটা। 'খুব ভাল মূর্তি, জানেন। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। সত্যি বলতে কী, ম্যাডাম, দাম আপনি খুব কমই নিয়েছেন। আরে, হ্যাঁ, বসে থাকি কেন?' আবার উঠে দাঁড়াল লোকটা। 'মূর্তিগুলো এই সুযোগে গাড়িতে তুলে ফেললেই তো পারি।' বেরিয়ে গেল সে।

উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে রবিনের চেহারা। বেচাকেনা শেষ, টাকাও নিয়ে ফেলেছেন মেরিচাচী। কথা দিয়ে ফেলেছেন, সবগুলো মূর্তি দেবেন লোকটাকে। এখন কী করা? কিশোর যে দুটো আনতে গেছে, ওগুলোর মধ্যে অগাসটাসও

থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে? আইনত এখন ওটাও কালো-গুঁফোর জিনিস। অস্থির হয়ে উঠল সে।

ব্যাপারটা মেরিচাচীর চোখ এড়াল না। 'আরে, রবিন! এমন করছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে?'

'আগেই আপনাকে বলা উচিত ছিল, চাচী,' অনেক চেষ্টায় যেন কথা বেরোল রবিনের মুখ দিয়ে। 'অগাস্টের খুব ইচ্ছে ছিল, একটা মূর্তি কিনে বাড়ি নিয়ে যাবে। হাজার হোক, তার দাদার জিনিস...'

'আগেই বলা উচিত ছিল,' মেরিচাচীর মুখ কালো হয়ে গেল। 'এখন তো আর সম্ভব নয়। কথা দিয়ে ফেলেছি ভদ্রলোককে...। ওই যে, কিশোর এসেছে...'

শেষ মূর্তিটা সবে গাড়িতে তুলেছে কালো-গুঁফো, এই সময় অফিসের কাছে এসে থামল পিকআপ। ঘোঁউউউ করে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

গাড়ির পিছন থেকে লাফিয়ে নামল কিশোর আর মুসা। তাড়াহুড়ো করে এসে দাঁড়াল কেবিনের দরজার কাছে। দরজা খুলে গেল। বোরিস নামল, এক এক করে বের করল মূর্তিদুটো। বেকনকে নিল মুসা, কিশোর অগাস্টাসকে। চেপে ধরে রেখেছে বুকের সঙ্গে, নইলে পড়ে যাবে।

দুজনের কেউই প্রথমে দেখতে পেল না কালো-গুঁফোকে।

লোকটা এসে দাঁড়াল ছেলেদের সামনে। 'দাও, আর তোমাদের কষ্ট করার দরকার নেই। আমিই তুলতে পারব।' অগাসটাসের দিকে হাত বাড়াল। 'এগুলো কিনে নিয়েছি।' মূর্তিটাকে দু'হাতে চেপে ধরে টান মারল সে।

আট

মূর্তি ছাড়ল না কিশোর। লোকটাও টানছে। চেঁচিয়ে উঠল রাগে, 'এই ছেলে, ছাড়ছ না কেন? বললাম না, কিনে নিয়েছি?'

'দিয়ে দে, কিশোর,' ডেকে বললেন মেরিচাচী।

'চাচী!' মূর্তিটাকে আরও শক্ত করে ধরে প্রতিবাদ করল কিশোর। 'অগাস্টকে এটা দেব কথা দিয়েছি আমি!'

'দিয়ে দে, বাবা, আমি জানতাম না! ভদ্রলোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ফেলেছি!'

'কিন্তু ওনার চেয়েও অগাস্টের এটা বেশি দরকার!' ভারি মূর্তি, তার ওপর টানাটানি, আর ধরে রাখতে পারছে না কিশোর। 'ওর কাছে এটা বাঁচা-মরার সামিল!'

'কী বলছিস! একটা মাটির মূর্তি বাঁচা-মরার সামিল!' রাগ করলেন মেরিচাচী। 'তোদের মাথা খারাপ হয়েছে! দিয়ে দে ওটা। নইলে বদনাম হয়ে যাবে। লোকে বলবে, কথা দিয়ে কথা রাখে না পাশারা!'

'দাও!' গর্জে উঠল কালো-গুঁফো। 'হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারল।'

চাচীর কথায় এমনিতেই ঢিল দিয়ে ফেলেছিল কিশোর, আচমকা টানে খসে গেল হাত থেকে, সামলাতে পারল না লোকটা, মূর্তি নিয়ে উল্টে পড়ল। 'সে-ও ধরে

রাখতে পারল না ভারি জিনিসটা, পড়ে গেল হাত থেকে, ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল ছেলেরা।

মেরিচাচী দূরে রয়েছেন, তাই দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু চার কিশোর পরিষ্কার দেখছে। লাল উজ্জ্বল একটা পাথর, পায়রার ডিমের সমান বড়, অগাসটাসের ভাঙা মাথার ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে।

নিশ্চল হয়ে গেছে যেন ছেলেরা।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কালো-গুঁফো। দেখতে পেল পাথরটা, সঙ্গে সঙ্গে উবু হয়ে তুলে নিয়েই পকেটে ভরল।

অফিসের দরজায় বেরিয়ে এসেছেন মেরিচাচী, সেদিকে ফিরল সে। বলল, 'আমার দোষেই পড়েছে। আর হ্যাঁ, আর কোন মূর্তির দরকার নেই আমার। চলি।'

গাড়িতে উঠে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল সে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে দ্রুত চলে গেল।

ইয়ার্ডের গেট দিয়ে সিড্যানটাকে বেরিয়ে যেতে দেখল ছেলেরা হতাশ দৃষ্টিতে।

'গেল!' প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'নিয়ে গেল রক্তচক্ষু! কিন্তু তখন না আলোচনা হলো, কালো-গুঁফো বলতে কেউ নেই? রয় হ্যামারের কল্পনা? তা হলে ও কে?'

'ভুল একটা কিছু হয়েছে,' সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে কিশোরের পিঠ, চোখে মুখে রাজ্যের হতাশা।

'আজ লাইব্রেরিতে গিয়েছিল কালো-গুঁফো,' রবিন বলল। 'আমি যাওয়ার আগে। রক্তচক্ষুর ব্যাপারে তথ্য খুঁজেছে সে।'

'এমন কাণ্ড ঘটবে ভাবিইনি!' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'জিনিসটা পেয়েও রাখতে পারলাম না, ছুঁতেই পারলাম না। সরি, গাস।'

'তোমার কী দোষ?' সান্ত্বনা দিল অগাস্ট। 'খামোকা মন খারাপ কোরো না।'

'আমি এতই শিওর ছিলাম যে কালো-গুঁফো নেই...,' বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর।

মেরিচাচী বললেন, 'ঠিকই, তোর কোন দোষ নেই। তুই তো ছেড়েই দিয়েছিলি, ও ধরে রাখতে পারেনি। ওর দোষ। টুকরোগুলো ফেলে দিয়ে আয়। কিন্তু বাকি টাকাটা ফেরত নিল না...'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

ফিরে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'আরিব্বাবা, অনেক বেড়েছে! তোরা বসবি নাকি, না বন্ধ করে দেব?'

'বসব,' কিশোর বলল। 'তবে বেশিক্ষণ না।'

'গেট খোলাই থাক তা হলে। আরও একআধজন কাস্টোমার এসেও পড়তে পারে।'

মাথা কাত করে সায় জানাল কিশোর।

অফিস থেকে বেরিয়ে ছিমছাম ছোট্ট সুন্দর দোতলা বসতবাড়ির দিকে রওনা

দিলেন মেরিচাচী।

নীরবে ভাঙা টুকরোগুলো তুলে নিয়ে এল চার-কিশোর, গোয়েন্দা প্রধানের নির্দেশে একটা টেবিলে রাখল। টুকরোগুলো পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। 'দেখো, দেখো,' মাথার ভাঙা টুকরোয় একটা ডিম-আকারের গর্ত, 'এর মধ্যেই ছিল রক্তচক্ষু।'

'ছিল, এখন আর নেই,' নিরাশ হয়ে পড়েছে রবিন। 'গুঁফোর হাত থেকে ওটা আর কোনদিন আনা যাবেও না।'

'এখন তাই মনে হচ্ছে বটে,' পরাজয় মেনে নিতে পারছে না কিশোর পাশা। 'ভালমত ভাবলে উপায় বেরিয়েও যেতে পারে। চলো, ওয়ার্কশপে গিয়ে বসি। অযথা অফিস খোলা রেখে লাভ নেই। আজ আর কেউ আসবে না। ওখানে গিয়ে আলোচনা করব।'

ওয়ার্কশপে এসে বসল ছেলেরা।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'রক্তচক্ষুর ব্যাপারে কী কী জেনেছ?'

নোট বের করে পাথরটার রক্তাক্ত ইতিহাস পড়ল রবিন। জানাল কাটিরঙ্গার প্রতিশোধ-পরায়ণ ভীষণ উপজাতির কথা।

'মারছে রে!' খাইছে আর সেরেছের মত এই শব্দটাও কিশোরের কাছ থেকেই শিখেছে মুসা। 'শুনেই লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে! পাথরটা গেছে, ভালই হয়েছে। মরুকগে এখন কালো-গুঁফো।'

'কিন্তু, লোকে এটাও বলে: পঞ্চাশ বছর কেউ না ছুঁলে শুদ্ধ হয়ে যাবে পাথরটা,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'যদি পঞ্চাশ বছর হয়ে গিয়ে থাকে? কিছুই হবে না গুঁফোর।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল মুসা। 'কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি নাও হতে পারে।'

'হুমম!' ধীরে ধীরে মাথা দোলাল অগাস্ট। জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'বুঝতে পারছি, কেন দাদা ওটাকে ভয় পেত। কেন লুকিয়ে রেখেছিল মূর্তির মধ্যে। পঞ্চাশ বছর যাতে ওটাকে কেউ না ছুঁতে পারে! সময় গেলে ওটা অভিশাপমুক্ত হয়ে যাওয়ার পর বের করে বিক্রি করে দিত। কিন্তু সময় পায়নি দাদা, তাই আমার জন্যে রেখে গেছে। আমি শিওর, রক্তচক্ষু শাপমুক্ত হয়ে গেছে।'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু লাভ নেই। গুঁফোর হাত থেকে কী করে বের করে আনব ওটা, জানি না।'

'ভূত-থেকে-ভূতে!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কালো-গুঁফোর সন্ধানে লাগিয়ে দিই। ওর খোঁজ পাওয়া গেলেই...ইয়ে, গেলেই...,' গেলে কী করবে, সেটা আর বলতে পারল না সে।

'গেলেই,' বাক্যটা শেষ করে দিল কিশোর, 'ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা যেত পাথরটা। কিন্তু নথি, জানো, এই শহরে কালো গোঁফওয়ালা লোক কত আছে? শয়ে শয়ে। তা ছাড়া ওটা যে লোকটার সত্যিকারের গোঁফ, তাই বা জানছি কী করে? নকলও হতে পারে।'

'হুঁ!' চুপসে গেল রবিন।

দীর্ঘ নীরবতার পর মুখ খুলল অগাস্ট, 'আর কোন ভরসাই নেই!'

আবার নীরবতা। এমনকী কিশোর পাশাও কোন উপায় বের করতে পারছে না।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ঘণ্টা।

'বেল!' লাফিয়ে উঠল রবিন। 'কাস্টোমার!'

'যাই, আমি দেখি,' ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল কিশোর, অফিসের দিকে চলল। তাকে অনুসরণ করল অন্য তিনজন।

খোলা জায়গায় বেরিয়েই খরিদ্দারকে দেখতে পেল ওরা। কালো চকচকে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে কালো ছড়ি।

'খাইছে!' ফিসফিস করল মুসা। 'তিন-ফোঁটা!'

'এই যে, ছেলেরা,' মিষ্টি করে হাসল লোকটা। 'ওগুলো দেখলাম পরীক্ষা করে,' ছড়ি তুলে ভাঙা টুকরোগুলো দেখাল সে। 'নিশ্চয়ই অগাসটাস অভ পোল্যান্ডের। ওটা এলেই আমাকে টেলিফোন করার কথা বলেছিলাম, ভুলে গেছ?'

'করতাম, সার,' কিশোর বলল। 'কিন্তু তার আগেই ভেঙে গেল।'

'কীভাবে?' আবার হাসল তিন-ফোঁটা, ভয়ঙ্কর হাসি, নাদুস-নুদুস হরিণশিশু দেখেছে যেন ক্ষুধার্ত বাঘ। 'ভাঙা মাথায় একটা গর্তও দেখেছি, ডিমের আকার। ওখানে কিছু লুকানো ছিল মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, সার, ছিল,' আবার বোকার অভিনয় শুরু করেছে কিশোর, কণ্ঠস্বর ভোঁতা। 'এক কাস্টোমার টানাহেঁচড়া শুরু করেছিল, আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। ফেলে দিয়ে ভেঙেছে। তারপর কী জানি একটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। ভাল করে দেখতে পারিনি।'

চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবল তিন-ফোঁটা। 'লোকটার কালো গোঁফ ছিল? আর ভারি চশমা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সার, হ্যাঁ!' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

নীরবে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করল অন্য তিন কিশোর।

'আর,' আবার বলল লোকটা, 'ও যা নিয়ে গেল সেটা কি এ-রকম?' পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে টেবিলে ছুঁড়ে দিল সে।

লাল একটা পাথর!

রক্তচক্ষু! রক্তচক্ষু!

চমকটা সামলে নিতে কিশোরেরও সময় লাগল। ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, ও-রকমই।'

'আমম!' ছড়িতে ভর রেখে দাঁড়াল তিন-ফোঁটা। 'রক্তচক্ষুর নাম শুনেছ? শুনেছ, ওটা নিলে কী সাংঘাতিক অভিশাপ নেমে আসে? এমন কী যে ছোঁয়, সে-ও রেহাই পায় না?'

জবাব দিলে কী হবে, বুঝতে পারছে না কেউ, তাই চুপ করে রইল। অবাক হয়ে ভাবছে পাথরটা তিন-ফোঁটার দখলে এল কীভাবে! বড় জোর ঘণ্টাখানেক আগে এটা নিয়ে পালিয়েছিল কালো-গুফো।

'একটা জিনিস দেখাচ্ছি,' ছড়ি তুলে বোতাম টিপে দিল তিন-ফোঁটা। সড়াৎ করে বেরিয়ে এল বারো ইঞ্চি লম্বা ছুরি। ফলাটার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকাল। 'নোংরা!' পকেট থেকে রুমাল বের করে ছুরি মুছল সে। লাল আঠালো পদার্থ লেগে গেল তাতে।

'রক্ত লেগে থাকলে ইস্পাত নষ্ট হয়ে যায়,' তিন-ফোঁটার হাসি হাসি মুখ, ভাবভঙ্গি আর বলার ধরন ভয়ংকর। 'সে যাকগে...' ছুরির ফলায় ঠেকিয়ে পাথরটা টেবিলের মাঝখান থেকে টেনে আনল সে। তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল কিশোরের দিকে। 'দেখো! ভাল করে দেখো।'

হাতে নিয়ে পাথরটা চোখের সামনে ধরল কিশোর। অন্য তিনজন ঘিরে এল তাকে, ওরাও দেখতে চায়। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না ওদের।

'কই, কিছুই তো দেখছি না!' কিশোর বলল।

'দাও,' পাথরটা নিয়ে ছুরি দিয়ে পোঁচ মারল তিন-ফোঁটা। আবার ওটা কিশোরের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'এবার দেখো।'

হালকা একটা দাগ পড়েছে পাথরের গায়ে।

'আঁচড়!' কিশোর বলল। 'আঁচড় লেগেছে! কিন্তু চুনি তো ইস্পাতের চেয়ে শক্ত বলেই জানতাম! দাগ কাটল কীভাবে!'

'ঠিকই জানো,' খুশি হয়েছে তিন-ফোঁটা। 'তারমানে চেহারা দেখে যা মনে হচ্ছে, তা তুমি নও। ভীষণ চালাক ছেলে তুমি কিশোর পাশা, বোকার অভিনয় ছাড়ো। বিকেলে বুঝিনি। একটু আগে তোমার স্বাভাবিক চেহারা দেখলাম, তারপর হঠাৎ করেই অভিনয় শুরু করলে। যাকগে, এবার বলো তো, এই আঁচড় লাগার মানে কী?'

আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সহকারী গোয়েন্দার মুখে। ধরা পড়ে গিয়েছে, আর অভিনয় করে লাভ নেই। পাথরটার দিকে চেয়ে রইল এক মুহূর্ত, নীরবে। হঠাৎ মুখ তুলল। 'এটা আসল পাথর নয়। নকল, ছাঁচে ফেলে বানানো হয়েছে প্লাস্টিক দিয়ে।'

'চমৎকার!' প্রশংসা করল তিন-ফোঁটা। 'ঠিক বলেছ। আর হ্যাঁ, যা ভাবছ, তাই, কালো-গুঁফোর কাছ থেকেই নিয়েছি এটা। আসল রক্তচক্ষু এখনও লুকানোই রয়েছে। আমার ধারণা, অগাসটাসের আরেকটা মূর্তি কোথাও আছে। তোমরা যেগুলো বিক্রি করেছ, তার মধ্যেও থাকতে পারে। আমি চাই, আমার হয়ে খুঁজে বের করো ওটা।'

এক এক করে চার কিশোরের মুখেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল তিন-ফোঁটা।

'আমি বলছি, অগাসটাসের মূর্তি খুঁজে বের করবে!' গর্জে উঠল সে হঠাৎ, হাসি হাসি ভাব চলে গেছে। 'নইলে...,' বোতাম টিপে ছুরির ফলা আবার খোলসের ভিতর ঢুকিয়ে নিল সে। 'থাক, তোমরা বুদ্ধিমান ছেলে, বলার আর দরকার নেই। বুঝতে পারছ। মূর্তিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে আমাকে।'

শান্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠল সে। চলে গেল। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল ছেলেরা।

'ব্যাটা...ব্যাটা, নিশ্চয় কালো-গুফোকে খুন করেছে! নীরবতা ভাঙল মুসা। 'হায় আল্লাহ, এত তাড়াতাড়ি কী করে আনল সে, গুফো পাথর নিয়ে পালিয়েছে?'

'রহস্য জমাট বাঁধছে,' সূক্ষ্ম খুশির আমেজ কিশোরের কণ্ঠে। 'মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট নকল পাথর কেন রাখলেন অগাসটাসের ভেতরে? আসল ভেবে নকলটাকে লুকিয়ে রাখেননি তো? নাকি ইচ্ছে করে জেনে শুনেই আরেকটা পাথর লুকিয়েছেন, ফাঁকি দেয়ার জন্যে? আসলটা তা হলে কোথায়? অন্য কোন মূর্তির ভেতরে? তেরোটার মধ্যে আর কোন অগাসটাস নেই, তা হলে...'

'আছে!' বিস্ফোরিত হলো যেন রবিনের কণ্ঠ, 'আছে!'

ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। অন্য দুজনও অবাক।

'ভুলেই গিয়েছিলাম,' বলল রবিন, 'এসেছি সেটা বলার জন্যেই, কিন্তু এমন সব কাণ্ড ঘটতে শুরু করল! বাবা বলল কথাটা। অকটেভিয়ান! রোমের সম্রাট ছিলেন, তাঁর আরেক নাম অগাসটাস। নিশ্চয় অকটেভিয়ানের মূর্তির কথাই বোঝাতে চেয়েছেন গাসের দাদা। অগাস্ট নামকরণ হয়েছে অকটেভিয়ানের কারণেই। ওই মূর্তিটাই এখন খোঁজা দরকার।'

নয়

'রক্তচক্ষুর কথা ভুলে যাওয়াই ভাল!' বিড়বিড় করল মুসা। 'পনেরো জন মরেছে, সঙ্গে আরও চারটে ছেলে যোগ হতে বাধা কী?'

'মুসা ঠিকই বলেছে,' অগাস্ট একমত হলো। 'রক্তচক্ষু পেলেও ও এখন নেবে কিনা জানি না। ভয় করছে!'

'কালো-গুফোর পরিণতি দেখো,' সায় পেয়ে গলার জোর বাড়ল গোয়েন্দা সহকারীর। 'নকলটা নিয়ে গেল, তাতেই এক ঘণ্টার বেশি টিকল না! আল্লাই জানে, আমাদের কী হবে!'

রবিন নীরব, কিশোরের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে আছে।

'পাথরটা খুঁজে পাইনি এখনও,' অবশেষে মুখ খুলল কিশোর, 'বিপদ আসবে কোথা থেকে? আগে তো খুঁজে বের করি, তারপর দেখা যাবে।'

'খুঁজব কিনা, সেটাও ঠিক করা দরকার,' মুসা বলল। 'এসো, ভোট নেই। যে খোঁজার বিপক্ষে, হাত তোলো।'

দেখা গেল, মুসা একাই হাত তুলেছে। অগাস্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, আর রবিনের বিশ্বাস রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধানের ওপর, তাই হাত তুলছে না। তা ছাড়া, ওরা ভোটে জিতলেই কি কিশোরকে ঠেকানো যাবে? এর আগে কখনও পেরেছে? কিশোরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তাকে বিরত করা মুসা আর রবিনের কর্ম নয়।

বোকা হয়ে গেল যেন মুসা, সে ভেবেছিল, অগাস্ট আর রবিন তার সঙ্গে যোগ দেবে। হেরে গিয়ে ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে নিল আবার। বিড়বিড় করে কী বলল, বোঝা গেল না। কিশোরের দিকে ফিরল। 'তুমিও মরবে, আমাদেরও মারবে। কোন আক্কেলে যে যোগ দিয়েছিলাম তিন গোয়েন্দায়!...তো, এখন কী করা? পুলিশকে

ফোন করব? কালো-গুফো খুন হয়েছে যে জানাব?'

'প্রমাণ আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। 'প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করবে না পুলিশ। তবে, লাশটা পাওয়া গেলে যা জানি গিয়ে বলতে পারব।' একটু থেমে বলল, 'একটাই উপায় দেখা যাচ্ছে, অকটেভিয়ানের মূর্তি খুঁজে বের করতে হবে এখন। তার জন্যে ভূত-থেকে-ভূতের দরকার।' ঘড়ি দেখল। 'সাতটা বাজে, ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে এতক্ষণে। চালু করে দেয়া যায় ভূতদের।'

দেরি করল না আর কিশোর। এক এক করে তার পাঁচজন বন্ধুকে ফোন করল। পরদিন সকাল দশটার মধ্যে খবর জানাতে অনুরোধ করল। তারপর রবিন ফোন করল পাঁচজনকে, সব শেষে মুসা।

আপাতত আর কিছু করার নেই। রাতটা তার সঙ্গেই অগাস্টকে থাকার আমন্ত্রণ জানাল কিশোর।

অগাস্ট রাজি।

সাইকেল নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো মুসা আর রবিন।

'কী মনে হয়?' পাশাপাশি চলতে চলতে বলল মুসা। 'অকটেভিয়ানটা পাওয়া যাবে?'

'না পেলে গেল রক্তচক্ষু,' বলল রবিন। 'পানি লেগে হয়তো কোন এক সময় গলে যাবে মূর্তিটা, বেরিয়ে পড়বে পাথর। বাগানে পড়ে থাকবে। যার চোখে পড়বে, সে না-ও চিনতে পারে, দাম না-ও বুঝতে পারে। হয়তো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কিংবা ডাস্টবিনে নিয়ে ফেলবে। আর চিনে ফেললে তো মজাই মেরে দিল।'

একটা জায়গায় এসে আলাদা হয়ে গেল দু'জনে।

বাড়ি পৌঁছল রবিন। ঘরে ঢুকে দেখল, রিসিভার কানে ঠেকিয়ে ডায়াল করে যাচ্ছেন তার বাবা। বিরক্ত হয়ে খটাস করে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। রবিনকে দেখেই বলে উঠলেন, 'কাণ্ড! সারা রকি বীচই যেন পাগল হয়ে উঠেছে! একটা লাইন খালি নেই, সব এনগেজড! আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করছি, লাইন পাচ্ছি না! আশ্চর্য!'

কারণটা জানে রবিন, কিন্তু চুপ করে রইল। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে, সবাই এখন টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত।

কাপড় ছেড়ে সোজা গিয়ে বিছানায় উঠল রবিন। কিন্তু ঘুম আসছে না, খালি এটা ভাবে, ওটা ভাবে।

ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখল রবিন: ঘোড়ায় চড়ে একদল খুনে ডাকাত তাড়া করেছে তাকে, সবার হাতে ছুরি লাগানো কালো ছড়ি।

চোখ মেলল এক সময়। পুব আকাশে অনেকখানি উঠে এসেছে সূর্য। বাতাসে বেকন ভাজার সুবাস, প্রথমেই মুসার কথা মনে এল রবিনের। মুচকে হাসল।

কাপড় পরে তৈরি হয়ে নীচে নামল রবিন। রান্নাঘরে বেকন ভাজায় ব্যস্ত মা।

'মা? কিশোর ফোন করেছে?'

'দাঁড়া, ভেবে দেখি...,' রবিনের দিকে না তাকিয়েই হাসলেন মা, কড়াইটা চুলা থেকে নামিয়ে ফিরলেন। আঙুল থুতনিতে ঠেকিয়ে গভীর চিন্তার ভান

করলেন। 'করেছিল।'

'কী বলেছে?'

'আকাশেতে উড়িতেছে একপাল হাতি, পূর্ণিমা চাঁদ যেন অমাবস্যার রাতি।'

ভ্রূকুটি করল রবিন। এটা কোন মেসেজ হতে পারে না। 'যাহ্, ঠাট্টা করছ! সত্যি, বলো না, কী বলেছে?'

হাসলেন মা। 'তা হলে আরেকবার ভাবি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এটা আর সেটা, শুধু আমরাই জানি, কাউকে সামলাতে হবে টেলিফোনের কানি! কী মানেরে এর?'

'তোমার আগের কথাটার কী মানে ছিল?'

'ওটা তো এমনি বানিয়ে বলেছে, মজা করার জন্যে।'

'এটাও কিশোর বানিয়ে বলেছে।'

'তা বলেছে, কিন্তু এর কোন মানে নিশ্চয় আছে। তোদের কাজ-কারবার জানতে তো আর আমার বাকি নেই। হ্যাঁরে, রবিন, আবার কোন একটা আজব কেসে জড়িয়েছিস বুঝি?'

'হ্যাঁ, মা,' তাড়া দিল রবিন, 'দাও, জলদি নাশতা দাও।'

'এবার কী? ডানাওয়ালা হাতি খুঁজছিস?' প্লেটে ডিম আর বেকন বাড়তে শুরু করলেন মা। টোস্টার থেকে টোস্ট নিয়ে রাখলেন আরেকটা প্লেটে।

রান্নাঘরের ছোট টেবিলেই খেতে বসে গেল রবিন। 'রোমের সম্রাট অকটেভিয়ানকে খুঁজছি। ওর মালিক এক ইংরেজ কিশোর, অগাস্ট অগাস্ট, পেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

কফি ছলকে পড়ল মায়ের হাতের কেটলি থেকে। চমকে উঠেছেন। হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

হাসল রবিন। খানিক আগে মা তাকে বোকা বানিয়েছিলেন, এখন সে শোধ নিচ্ছে। 'হ্যাঁ, মা, ঠিকই বলেছি। পরে সব বুঝিয়ে বলব, এখন সময় নেই।'

নীরবে ঠোঁট বাঁকালেন মা, কফি ঢালায় মন দিলেন। আবার রবিনের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, 'ওকী, সবই যে রইল! এই ভাল হবে না, যা দিয়েছি সব খাবি। নইলে বেরোতেই দেব না।'

অগত্যা আবার বসে পড়তে হলো রবিনকে।

যত তাড়াতাড়ি পারল, সাইকেল চালিয়ে ইয়ার্ডে এসে ঢুকল রবিন। অফিসে মেরিচাচী একা। বাইরে কাজে ব্যস্ত বোরিস আর রোভার।

রবিন অফিসে ঢুকতেই মুখ তুললেন চাচী। 'এই যে, এসে গেছ, বসো। মুসা আর গাসকে নিয়ে বেরিয়েছে কিশোর, এই আধ ঘণ্টামত হবে। তোমাকে ওয়ার্কশপে বসতে বলে গেছে।'

মেরিচাচীকে ধন্যবাদ জানিয়ে হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল রবিন। কিশোরের মেসেজের মানে: হেডকোয়ার্টারে টেলিফোনের পাশে অপেক্ষা করতে হবে রবিনকে। কেন অপেক্ষা করতে বলেছে, তা-ও জানে রবিন। দশটার পর যে কোন মুহূর্তে 'ভূতের' ফোন আসতে পারে। খবর জানাতে পারে।

রবিন চেয়ারে বসতে না বসতেই ফোন বেজে উঠল। ঘড়ি দেখল, দশটা বেজে

পাঁচ। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। 'হাল্লো, তিন গোয়েন্দা। রবিন বলছি।'

'হ্যালো,' কিশোরকণ্ঠে জবাব এল, 'আমি জিম। আমার বোন পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে একটা মূর্তি কিনেছে।'

ধক করে উঠল রবিনের বুক। 'নাম কী? অকটেভিয়ান?'

'নাম? দেখতে হচ্ছে। ধরে রাখো, আমি দেখে আসি।'

বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে রবিনের। একেকটা সেকেন্ড একেক যুগ বলে মনে হচ্ছে। এত তাড়াতাড়িই কাজ হয়ে গেল! বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

সাড়া এল পুরো এক মিনিট পর। 'হ্যালো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো!' কানের ওপর জোরে রিসিভার চেপে ধরেছে রবিন, ব্যথা পাচ্ছে সে খেয়ালও নেই।

'বিসমার্ক,' জবাব এল। 'অকটেভিয়ান না। চলবে?'

'না, থ্যাংক ইউ,' হতাশা ঢাকতে পারল না রবিন। 'থ্যাংক ইউ। অকেটেভিয়ানকে দরকার আমাদের।' তৃতীয়বার ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল সে।

আরও এক মিনিট চুপচাপ বসে রইল রবিন। শেষে টাইপরাইটার টেনে নিল। এ-যাবৎ যা যা ঘটেছে, বিস্তারিত লিখে ফেলবে।

লেখা শেষ করতে করতে দুপুর হয়ে গেল, ইতিমধ্যে আর ফোন এল না। আশাই ছেড়ে দিল রবিন, এবার কায়দাটা বোধহয় বিফলেই গেল।

'রবিন! এই রবিন!' মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে। 'খেতে এসো।'

'আসছি,' মাইক্রোফোনে জবাব দিল রবিন।

কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে উঠল সে। দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা সবে তুলেছে, এই সময় বেজে উঠল ফোন। থমকে গেল সে। হাত থেকে ঢাকনাটা ছেড়ে দিয়ে দুই লাফে গিয়ে পৌঁছল ফোনের কাছে। 'হাল্লো! তিন গোয়েন্দা! রবিন বলছি।'

'অকটেভিয়ানের খবর চেয়েছিলে?' একটা মেয়ে। 'আমার মা কিনে এনেছে। বাগান সাজাতে চেয়েছিল, কিন্তু বসানোর পর আর পছন্দ হয়নি। পাশের বাড়ির মহিলাকে দিয়ে দেবে ভাবছে।'

'কোন দরকার নেই, প্লীজ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'জিনিস পছন্দ না হলে রাখার কোন দরকার নেই। আমরা আসছি এখুনি, টাকা ফেরত দিয়ে মূর্তিটা নিয়ে আসব।'

নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে রিসিভার রেখে দিল রবিন। হলিউডের ঠিকানা, রকি বীচ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু অসুবিধে নেই। গাড়ি নিয়ে গেলে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। চট করে ঘড়ি দেখে নিল।

ইস্‌স্, কিশোরটা করছে কী। অকটেভিয়ানের খোঁজ পাওয়া গেছে, ও থাকলে খেয়ে নিয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়া যেত। দেরি করে ফেললে পেয়েও না আবার হারাতে হয় মূর্তিটা!

দশ

গাল ফুলিয়ে রেখেছে মুসা, মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ছে। সাইকেল নিয়ে খাড়াইয়ে উঠছে, ছোট একটা টিলা পেরিয়ে বেরিয়ে এল ডায়াল ক্যানিয়নে। তার পেছনে কিশোর আর অগাস্ট।

হলিউডের উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ের বেশ ওপর দিকে এই গিরিপথটা। সরু একটা পথ চলে গেছে, পাহাড়ের ওপরে সমতল একটা জায়গায় গিয়ে শেষ। এইখানেই হোরাশিও অগাস্টের বাড়ি, ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা বিরাট এলাকা জুড়ে।

বাড়িটায় ঘুরে যাওয়ার বুদ্ধি কিশোরের। জানে না, কী খুঁজতে এসেছে। অগাস্টের দাদা কোন বাড়িতে থাকতেন, কেমন জায়গা, না দেখলে মানুষটা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া কঠিন, আসার এটাই প্রধান কারণ।

যত সহজ মনে হয়েছিল, সাইকেল নিয়ে এই পাহাড়ে চড়ার কাজটা তত সহজ হলো না। দুপুর হয়ে এসেছে, মাথার ওপর গনগনে সূর্য, দরদর করে ঘামছে ওরা, হাঁপাচ্ছে পরিশ্রমে। থেমে মুখের ঘাম মুছে নিল তিনজনেই, হোরাশিও অগাস্টের খালি বাড়িটার দিকে তাকাল।

তিনতলা বাড়ি, কোন অংশ পাকা, কোন অংশ কাঠের, চমৎকার একটা স্টাইল। চারদিকে খোলামেলা, আলো আর হুহু বাতাসের অন্ত নেই! কিন্তু একেবারে নির্জন। সাইকেল ঠেলে নিয়ে এল ওরা সদর দরজার কাছে, ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখল।

'চাবি ছাড়া ঢুকবে কীভাবে?' দেখে শুনে বলল মুসা। 'তখনই বলেছিলাম, চাবিটা নিয়ে নিই রয় হ্যামারের কাছ থেকে।'

'চলো, জানালা ভেঙে ঢুকে পড়ি,' পরামর্শ দিল অগাস্ট।

'দরকার পড়লে তাই করতে হবে, কিশোর বলল। 'বাড়ির মালিক হয়তো কিছুই মনে করবে না, দু'চারদিনের মধ্যে পুরো বাড়িই তো ভেঙে ফেলবে।' পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করল সে। 'তবে আশা করছি জানালা ভাঙার দরকার পড়বে না, এগুলোর কোনটা না কোনটা লেগে যাবেই। আমেরিকার নাম করা সব কোম্পানির সব রকমের তালার চাবি আছে এখানে।'

'এক তালার চাবি আরেক তালায় লাগবে?' অগাস্টের সন্দেহ রয়েছে।

'না লাগারই কথা, তবে লেগেও যেতে পারে।'

তিন ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে দরজার কাছে চলে এল ওরা, নব ধরে মোচড় দিল মুসা। তাকে অবাক করে দিয়ে পুরো ঘুরে গেল নব, ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা। 'খোলা! খিল-টিল কিচ্ছু লাগানো নেই!'

'অস্বাভাবিক!' আপন মনে বিড়বিড় করল কিশোর।

'খোলাই ফেলে গিয়েছে হয়তো রয় হ্যামার,' মুসা বলল, 'কিংবা, অন্য কেউ কোন কারণে খুলেছিল, আর লাগায়নি। খালি বাড়ি তো, মালপত্র নেই, লাগানোর দরকার মনে করেনি।'

অন্ধকার একটা হলঘরে এসে ঢুকল ওরা। ঘরটার দু'পাশে আরও দুটো বড়

ঘর, খালি, ধুলোয় ঢাকা, মেঝেতে কাগজের টুকরো ছড়ানো।

একটা ঘরে ঢুকল কিশোর, অনুমান করল, এটা শোবার ঘর। চারপাশে তাকাল, কিন্তু দেখার তেমন কিছু নেই। কোন আসবাব নেই। পাতলা ওয়ালনাট কাঠ দিয়ে দেয়াল পুরো ঢেকে দেয়া হয়েছে, গাঢ় চকলেট রঙের ওপর ধুলোর আস্তরণ।

না, কিছুই দেখার নেই এখানে, ঘুরল কিশোর। হলঘরে এসে ঢুকল আবার, উল্টোদিকের ঘরটায় চলে এল। লাইব্রেরি ছিল, দেয়ালে গাঁথা সারি সারি তাক দেখেই বোঝা যায়, তিন দিকের সব ক'টা তাক এখন নিঃস্ব, তাতে ধুলোর রাজত্ব। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে একে একে সবগুলো তাকের ওপর নজর বোলাল কিশোর, অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে, 'আ!'

'আ! কীসের আ!' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'কী দেখলে?'

'দেখার চোখ থাকলে তুমিও দেখতে পেতে।' নাক বরাবর সামনে আঙুল তুলল কিশোর। 'ওই তাকটা, দেখো।'

তাকাল মুসা। 'কই, ধুলো ছাড়া আর কিছু দেখছি না!'

'শেষ মাথায়, অন্যগুলোর চেয়ে কোয়ার্টার ইঞ্চি বেশি লম্বা। নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে।'

এগিয়ে এসে তাকের শেষ মাথায় হাত রাখল কিশোর। টানাটানি করল। শেষে জোরে চাপ দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল একটা ছোট গোপন দরজা, পাল্লাসুদ্ধ তাক ভেতরে সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল একটা কালো ফোকর।

'হুঁ!' মাথা দোলাল কিশোর। 'বললাম না! কিছু একটা আছে।'

'ঠিকই তো!' কালো ফোকরটার দিকে চেয়ে আছে মুসা। 'পেলাম তা হলে কিছু!'

'টর্চ আনা উচিত ছিল। ভুলই করেছি। মুসা, চট করে গিয়ে সাইকেল থেকে একটা লাইট খুলে নিয়ে এসো।'

ছুটে বেরিয়ে গেল মুসা। লাইট নিয়ে ফিরে এল। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আগে ঢুকবে?'

'কেন, তুমি আগে যেতে ভয় পাচ্ছ নাকি?' কিশোর হাসল। 'ভয়ের কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

কিন্তু মুসা কথাটা মানতে পারল না। খালি বাড়ির অনেক গোপন ঘর দেখেছে সে এর আগে, কোনটাই পুরোপুরি নিরাপদ ছিল না।

আলো জ্বেলে সরু দরজা দিয়ে ঢুকে গেল কিশোর, তাকে অনুসরণ করল মুসা আর অগাস্ট।

তিন কদম এগিয়েই থেমে গেল।

না, মানুষের কংকাল নেই, ভয় পাওয়ার মত কিছুই চোখে পড়ছে না। একেবারে খালি। দেয়ালে তাক, এখানেও বই ছিল, লাইব্রেরিরই একটা অংশ।

'কিচ্ছু নেই।' কংকাল কিংবা মানুষের খুলি নেই দেখে হতাশই হলো যেন মুসা।

'কিছুই না?' প্রশ্ন করল কিশোর।

ভাল করে পুরো ঘরে আবার চোখ বোলাল মুসা। 'না, আমি কিছুই দেখছি না।'

'ভুল জায়গার দিকে ভুল ভাবে তাকিয়ে আছ। জিনিসটা এতই সাধারণ, তোমার মগজ ওটাকে গুরুত্বই দিতে চাইছে না, তাই দেখতে পাচ্ছ না।'

চোখ পিটপিট করল মুসা, আরেকবার দেখার চেষ্টা করল, যা কিশোর দেখতে পেয়েছে। 'না, বাবা, আমি দেখছি না! কী দেখেছ?'

'দরজা!' বলে উঠল অগাস্ট।

এইবার দেখতে পেল মুসা। বাদামী রঙের অতি সাধারণ একটা নব এমনভাবে বসানো, পাল্লার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে।

এগিয়ে গিয়ে নব ধরে মোচড় দিল কিশোর। সরু ছোট দরজা খুলে গেল সহজেই। ভেতরে আলো ফেলল সে। ধাপে ধাপে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে।

'ভাঁড়ার বোধহয়,' কিশোর বলল। 'চলো, দেখি কী আছে।'

'সবগুলো দরজা খোলা থাক,' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'দরজা লাগিয়ে অচেনা ঘরে ঢুকতে ভয় লাগে আমার।'

সিঁড়িতে পা রাখল কিশোর, নামতে শুরু করল। পেছনে অন্য দুজন। দু'পাশে দেয়াল এত চাপা, ওরা একটু এদিক ওদিক হলেই কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে।

সিঁড়ি শেষ হলো। সামনে আরেকটা দরজা। নব ধরে ধরে টানতেই খুলে গেল। ছোট একটা ঘরে এসে ঢুকল ওরা, ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস, পাথরের দেয়াল।

'ভাঁড়ার,' আলো তুলে দেখছে কিশোর।

বিচিত্র আকারের সব তাক, কেন ওরকম করে বানানো হয়েছে মাথায় ঢুকল না কিশোর কিংবা মুসার। খালি।

কিন্তু অগাস্ট চিনতে পারল। 'মদ রাখার ভাঁড়ার। বোতলের আকার আর মাপ মত বানানো হয়েছে। ওই যে, একটা ভাঙা বোতল পড়ে আছে।

হঠাৎ বরফের মত জমে গেল যেন কিশোর, সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে দিল। গাঢ় অন্ধকার গিলে নিল ওদেরকে।

'কী হলো!' ফিসফিস করে উঠল আতংকিত কণ্ঠ।

'শ-শ-শ্! কে জানি আসছে! দেখো!'

আবছা আলো দরজার ওপাশে, বোধহয় সিঁড়ির মাথায় রয়েছে এখনও লোকটা। চাপা গলায় কথা শোনা গেল।

'চলো ভাগি!' দরজার নব ধরে টান মারল মুসা, কোন কিছু না ভেবেই। পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল, অনেক পুরানো নব, তার ওপর ভেজা বাতাসে ক্ষয় হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে ধাতু, হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ছুটে চলে এল তার হাতে।

এগিয়ে আসছে আলো আর কণ্ঠস্বর।

ভাঁড়ারে আটকা পড়ল ছেলেরা।

এগারো

কাছে আসছে কণ্ঠস্বর।

দরজার বাইরে এসে থামল পদশব্দ। পাল্লার নীচ দিয়ে টর্চের আবছা আলো আসছে।

'এখানে তো আগেই খুঁজেছি,' ভারি গলায় বলল একজন। 'গিয়ে আর কী হবে?'

'পুরো বাড়িই খোঁজ হয়েছে,' আরেকটা কণ্ঠ, খসখসে, বিরক্তি মেশানো। 'আর এই ভাঁড়ারে তো আধা ঘণ্টা নষ্ট করেছি। হ্যারি, আমাদের ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে...'

'না না, ফাঁকি দিচ্ছি না, ফাঁকি দিচ্ছি না! কসম!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল তৃতীয় আরেকজন, বুড়ো মানুষের গলা। 'এ-বাড়িতে থেকে থাকলে খুঁজে পেতামই। বলেছি না, এখানে লুকানোর মত আর কোন জায়গা নেই। বিশ বছর ধরে কাজ করেছি এ-বাড়িতে...,' থেমে গেল সে।

হ্যারি, হ্যারিসন! মুসা অনুভব করল হঠাৎ শক্ত হয়ে গেছে কিশোর। রয় হ্যামার তা হলে ঠিকই বলেছে, হোরাশিও অগাস্টের চাকর হ্যারিসনও হাত মিলিয়েছে ষড়যন্ত্রে!

'মিছে কথা বললে ভাল হবে না, হ্যারি,' বলল প্রথমজন। 'ছেলেখেলা নয় এটা। অনেক টাকার ব্যাপার, তুমিও একটা ভাগ পাবে।'

'যা জানি, সবই তো বলেছি!' হ্যারির কণ্ঠে অনুনয়। 'আমি আর অ্যানি যখন বাইরে যেতাম, নিশ্চয় তখন কোন ফাঁকে লুকিয়েছে জিনিসটা। শেষ দিকে কাউকে বিশ্বাস করত না, আমাদেরও না। থেকে থেকেই চমকে উঠত, এদিক ওদিক দেখত, বোধহয় সন্দেহ করত কেউ তার ওপর চোখ রাখছে।'

'ভীষণ চালাক ছিল ব্যাটা!' খসখসে কণ্ঠ। 'মাথায়ই ঢুকছে না, অগাসটাসের মূর্তির ভেতরে নকল পাথরটা কেন রেখেছিল!'

কান খাড়া করে শুনছে ছেলেরা, বিপদে যে রয়েছে ভুলেই গেছে। নকল পাথরটার কথা জানে লোকগুলো, তার মানে ওরা কালো-গুঁফো অথবা তিন-ফোঁটার দলের লোক। পরের কথায়ই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'অথচ নকলটার জন্যেই জিকোর অবস্থা কাহিল! আহা, বেচারা!' হাসল খসখসে গলা।

হাসি শুনে কেঁপে উঠল মুসা, ভয়ংকর হাসি। ছুরির ফলা থেকে তিন-ফোঁটার রক্ত মুখে ফেলার কথা মনে পড়ল।

'হাসিঠাট্টার সময় না এটা,' ভারি কণ্ঠ আরও ভারি শোনাল। 'যা বলছিলাম, অগাসটাসের ভেতরে নকল পাথর কেন? নিশ্চয় বিপথে সরানোর জন্যে। আমি বলছি, আসল চুনিটা এই বাড়িতেই আছে কোথাও।'

'তা হলে আমার আর কিছু বলার নেই,' হ্যারিসনের গলা। 'পুরো বাড়িটা ভেঙে দেখতে পারেন এবার। কসম খেয়ে বলছি, আর কোন জায়গা জানি না আমি। দোহাই আপনাদের, আমাকে ছেড়ে দিন। স্যান ফ্রানসিসকোয় ফিরে যাব, এতক্ষণে হয়তো কান্নাকাটি শুরু করেছে অ্যানি। আমার সাধ্যমত আমি করেছি, আর কিছু করার নেই।'

'ভেবে দেখতে হবে,' বলল খসখসে গলা, 'আদৌ ছাড়ব কিনা...ইয়ার্ডের ওই ছেলেটাকে ধরা দরকার। আশপাশের অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছি, সবাই একবাক্যে বলেছে, খুব চালু ছোকরা। কম্পিউটারের মত কাজ করে নাকি ওর ব্রেন। বোকার ভান করে থাকে, ওটাও একটা চালাকি। পাথরটা কোথায় নিশ্চয়ই ও জানে।'

'কিন্তু ওকে ধরি কী করে?' ভারি কণ্ঠ। 'দেখি, একটা উপায় বের করতে হবে। চলো, ওপরে চলো, আলোচনা করিগে।'

'এই গোপন সিঁড়ি আর ভাঁড়ারটা কেন?' যেতে চাইছে না খসখসে গলা। 'এখানে আরেকবার খুঁজলে হত না? নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বানিয়েছে!'

'আরে দূর! ওই বুড়োর কাণ্ড!' বলল ভারি কণ্ঠ। 'সিঁড়িটাও সাধারণ, ভাঁড়ারটাও। মদ রাখত, নিরাপদে সংরক্ষণের জন্যেই বোধহয় বানিয়েছে ভাঁড়ার। তাই না, হ্যারি?'

'হ্যাঁ,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হ্যারিসন। 'মিস্টার অগাস্টের এটা এক খেয়াল। রাতেই শুধু এখানে আসতেন তিনি। প্রায়ই বলতেন, ছেলেবেলা থেকেই বিরাট বাড়িতে বাস করার শখ, যাতে থাকবে গোপন ভাঁড়ার, গোপন অন্ধকার সিঁড়ি।'

'আজব বুড়ো!' বলল ভারি গলা। 'চলো চলো, এই অন্ধকার, বদ্ধ বাতাস, দম আটকে আসে!'

আলো হারিয়ে গেল ধীরে ধীরে। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, দড়াম করে দরজা বন্ধ হলো। ভাঁড়ারে একা হয়ে গেল ছেলেরা।

'আউফ্ফ্!' চেপে রাখা শ্বাস ছাড়ল মুসা। 'আরেকটু হলেই গেছিলাম! যা সব লোক!'

'শয়তানের চেলা একেকটা! অগাস্ট বলল। 'হাসি কী! অথচ ওদের দলেরই একজনকে মেরে ফেলল তিন-ফোঁটা।'

'কী মনে হয়, কিশোর, ওরা কারা?' মুসা বলল। 'এই কিশোর, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি!'

স্বপ্ন থেকে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। 'অ্যাঁ!...ও, ভাবছিলাম। হ্যারিসনও ওদের দলে! তিন-ফোঁটার বিপক্ষে।'

'ওসব ভাবাভাবি পরে করলেও চলবে। বেরোনোর উপায় খোঁজো। আটকা পড়েছি, খেয়াল আছে?'

'এখানে অপেক্ষা করাই নিরাপদ। এখনও যায়নি ওরা। এসো, ভাঁড়ারটা ঘুরে দেখি।'

হয় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এখানে, কিংবা কিশোরের সঙ্গে যেতে হবে। দুটোতেই মুসার অনিচ্ছা। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকাটাই বেশি খারাপ মনে হলো, অগত্যা চলল কিশোরের পিছু পিছু।

উল্টো দিকে আরেকটা দরজা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। বড় চারকোনা আরেকটা ভাঁড়ার, নিচু ছাত, জানালা নেই। দেয়ালের গা ঘেঁষে এক-জায়গায় বড় একটা তেলের ট্যাংক, পাশেই মস্ত একটা তেলের চুলা। ব্যস, আর কিছু নেই।

উল্টো দিকে আরেকটা দরজা, তার ওপাশে সিঁড়ি। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে

উঠে গেল কিশোর, সিঁড়ির মাথায় দরজা, নব ধরে মোচড় দিল সে। খুলল না। আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে দেখল, অনড় রইল পাল্লা। কী ভেবে আর খোলার চেষ্টা করল না, নেমে চলে এল।

'ওপাশ থেকে ছিটকিনি লাগানো,' সঙ্গীদের জানাল কিশোর।

ব্যাপারটার মানে জানা আছে ওদের। দরজা খুলতে না পারলে, এখানেই আটকা থাকতে হবে। বাইরের কেউ জানবে না ওরা কোথায় আছে।

চুপ করে ভাবছে কিশোর। হঠাৎ বলল, 'যেখান দিয়েই ঢুকেছি ওখান দিয়েই বেরোতে হবে।'

'কীভাবে?' প্রতিবাদ করল অগাস্ট। 'নবের অর্ধেকটা খুলেছে, তালা আটকে গেছে। ওপাশ থেকে ছাড়া খোলা যাবে না। চাবিও নেই আমাদের কাছে।'

'আমারই দোষ!' বিষণ্ণ শোনাল মুসার কণ্ঠ।

'এসো, চেষ্টা করে দেখি, খোলে কিনা,' কিশোর বলল।

আবার আগের ভাঁড়ারটায় এসে ঢুকল ওরা। দরজার ভাঙা নবের কাছে আলো তুলে ধরল মুসা। কোমরে ঝোলানো সুইস ছুরিটা খুলে নিল কিশোর, অনেকগুলো ফলা, বিভিন্ন কাজে লাগে, তার খুবই প্রিয়! একটা ফলা খুলল, ছোট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার এটা।

'সাধারণ তালা,' ভালমত দেখে বলল কিশোর। 'খুলতেও পারে।' ছোট চারকোনা গর্তে স্ক্রু-ড্রাইভার ঢুকিয়ে মোচড় দিল সে। ঘুরল না। যন্ত্রটা আরেকটু ঠেলে দিয়ে আবার মোচড় দিল। ক্লিক করে ঘুরে গেল তালার জিভ, খুলে গেল।

এত সহজে তালা খুলে গেছে, বিশ্বাসই হচ্ছে না মুসা আর অগাস্টের।

পাল্লা খুলে উঁকি দিল কিশোর, সিঁড়ির অর্ধেকটা পর্যন্ত আবছা দেখা যাচ্ছে, তারপরে অন্ধকার। কেউ আছে বলে মনে হলো না।

সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল সে। অন্য দুজনকে ডাকল।

হঠাৎ জ্বলে উঠল আলো।

চোখ ধাঁধিয়ে দিল টর্চের আলো, চোখ পিটপিট করছে কিশোর, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

'বাহ্, এই তো আছে!' গমগম করে উঠল ভারি গলা। 'তাই তো বলি, সাইকেল রেখে গেল কোথায়! এসো, লক্ষ্মী ছেলের মত চুপচাপ উঠে এসো। নইলে...'

বারো

কিশোরের ব্যবহারে লক্ষ্মী ছেলের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। এক ঝটকায় ঘুরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দরজার ওপর, হাত বাড়িয়ে নবটা ধরার চেষ্টা করল। পারল না। ধাক্কা লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা।

সিঁড়ি বেয়ে দুপদাপ করে নেমে আসছে লোক দু'জন।

'ধরো, ধরো ওকে, জ্যাকি!' চেঁচিয়ে উঠল ভারি কণ্ঠ। 'ওর কথাই বলেছি।'

শক্তিশালী একটা থাবা কিশোরের হাত চেপে ধরল, মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের ওপর। আরেক হাতে শার্টের কলার চেপে ধরে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওপরে।

ভাঁড়ারে থেকে শব্দ শুনেই বুঝল মুসা আর অগাস্ট, কিশোরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

'ধরে ফেলল!' ঢোক গিলল মুসা, গলা শুকিয়ে কাঠ।

'নিয়ে যেতে বারোটা বাজছে ওদের,' অগাস্ট বলল। 'শুনছ, কী রকম শব্দ হচ্ছে? জোরাজুরি করছে ভীষণ।'

ব্যথায় 'আহ্‌হ্‌!' করে চেঁচিয়ে উঠল একজন।

'হাতে কামড় দিয়েছে বোধহয়।' হাসল অগাস্ট।

চটাস করে চড় পড়ার শব্দ হলো, থেমে গেল জোরাজুরির শব্দ।

'দুজন মিলে একজনকে ধরেছ, লজ্জা করে না! আবার মারছ!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'বেশ, তা হলে চুপ হয়ে যাও,' খসখসে কণ্ঠ বলল।

'হ্যাঁ, শান্তভাবে উঠে এসো, মারব না,' বলল ভারি কণ্ঠ। 'নইলে কপালে আরও দুঃখ আছে।'

'আরও দুটো তো রয়ে গেল,' খসখসে গলা।

'থাক,' ভারি কণ্ঠ। 'একেই আমাদের দরকার।'

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল, ছিটকিনি লাগাল, আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল পদশব্দ।

'কিশোর চুপ হয়ে গেছে,' শব্দ করে শ্বাস ফেলল অগাস্ট।

'তো আর কী করবে? দুজনের সঙ্গে পারবে না, খামোকা মার খাবে আরও।'

'ও পড়ল ডাকাতের হাতে, আমরা আটকা পড়লাম এখানে। আগে ছিল একটা, এখন দুটো দরজাই বন্ধ। বেরোনোর আশা শেষ।'

'কিশোর যখন বাইরে রয়েছে, আশা পুরোপুরিই আছে। কোন একটা উপায় ও ঠিক করে ফেলবে, বের করে নিয়ে যাবে আমাদের,' গভীর আস্থা মুসার কণ্ঠে।

তবে, মুসা বন্ধুর অবস্থাটা জানে না। কিশোর নিজেই ছুটতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে, থাক তো অন্য দুজনকে মুক্ত করা। হাত পিঠের ওপর মুচড়ে ধরে তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ভারি কণ্ঠ। রান্নাঘরে নিয়ে এল। একটা আসবাব আছে এখনও, একটা চেয়ার, এতই পুরানো, নড়বড়ে, ভাঙা; বাতিল মালের ক্রেতারাও নেয়নি, ফেলে গেছে।

ভারি কণ্ঠ বেঁটে, মোটা। খসখসে গলা বিশালদেহী। দুজনেরই কালো গোঁফ, ভারি হর্ন-রিমড চশমা। ইয়ার্ডে যে কালো-গুঁফো গিয়েছিল, তারও একই রকম গোঁফ আর চশমা ছিল, তবে এদের কেউ নয়।

হাত ছেড়ে দিয়ে কিশোরের কাঁধ চেপে ধরল ভারি কণ্ঠ, ঠেলে নিয়ে গিয়ে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল চেয়ারে।

'বাড়ির পেছনে কাপড় শুকানোর দড়ি আছে, দেখেছি,' খসখসে গলাকে বলল

সে। 'যাও তো, চট করে নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে গেল লোকটা।

কিশোরের দেহ তল্লাশি করল ভারি কণ্ঠ দক্ষ হাতে, ছুরিটা বের করে নিল। 'দারুণ জিনিস তো! বেশ ধার। নাক আর কান অতি সহজেই কেটে নেয়া যাবে,' কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল সে।

চুপ করে ভাবছে গোয়েন্দাপ্রধান। ভারি কণ্ঠকে শিক্ষিতই মনে হচ্ছে, সাধারণ চোর-ডাকাতের মত লাগছে না। খসখসে গলা অবশ্য সাধারণ গুণ্ডাই, তবে, ভরসা এই যে, আদেশের মালিক ভারি কণ্ঠ।

ছোটখাট একজন মানুষ দেখা দিল দরজায়, ধূসর চুল, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বোধহয় ও-ই হ্যারিসন। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'আরে, মারছেন নাকি? আমাকে কথা দিয়েছিলেন, খুনখারাপীতে যাবেন না, মনে আছে?'

'যাও এখান থেকে!' ধমকে উঠল ভারি কণ্ঠ। 'খুন করব কি করব না, ওর ওপর নির্ভর করছে। কথা মত চললে কিছুই করব না, নইলে...তুমি যাও এখান থেকে।'

দ্বিধাজড়িত পায়ে আস্তে করে পিছিয়ে গেল হ্যারিসন।

দড়ি নিয়ে এল খসখসে গলা। দুজনে মিলে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধল কিশোরকে। দুই হাত চেয়ারের হাতার সঙ্গে, পা চেয়ারের পায়ার সঙ্গে, কোমর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল চেয়ারের পেছনের সঙ্গে। মাথা ছাড়া শরীরের আর কোন অঙ্গই নড়ানোর উপায় থাকল না কিশোরের।

'তারপর খোকা,' আলাপী ভঙ্গিতে বলল ভারি কণ্ঠ, 'চুনিটা কোথায়।'

'জানি না, আমরাও খুঁজছি।'

'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, রাইস, তুমি সরো আমি দেখছি,' জানালার চৌকাঠে রাখা আছে কিশোরের ছুরিটা, তুলে নিল খসখসে গলা। বেছে বেছে পাতলা একটা ফলা খুলল, খুরের মত ধার, ঝকঝক করছে। 'কোন গালে আগে পোঁচ লাগাব, খোকাবাবু?' নিজের রসিকতায় নিজেই খিকখিক করে বিচ্ছিরি হাসি হাসল।

'তুমি থামো!' ধমক দিল রাইস, 'আমি কথা বলছি ওর সঙ্গে। সত্যিই বোধহয় জানে না। তবে, অনুমান করতে পারবে।' কিশোরের দিকে তাকাল। 'অগাসটাসের মাথায় নকল পাথরটা ঢুকাল কেন, বলতে পারবে?'

'মনে হয় লোককে বিপথগামী করার জন্যে।'

'আসলটা তা হলে কোথায়?'

'হয়তো আরেকটা মূর্তির ভেতরে, যেটাকে লোকে ভাবনার বাইরে রাখবে।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর, সত্যি কথাই বলবে। অকটেভিয়ান কোথায় আছে জানে না, লোকদুটোও নিশ্চয় জানে না, কাজেই সত্যি কথা বলেও ক্ষতি নেই। বরং লাভ। তাকে মুক্তি দিয়ে দেবে হয়তো। 'আমার ধারণা, অকটেভিয়ান।'

'অকটে...ঠিক, ঠিক বলেছ!' নিজের হাতেই চাপড় মারল লোকটা। 'রোমের সম্রাট ছিল অকটেভিয়ান, আরেক নাম অগাসটাস। অগাসটাস থেকে অগাস্ট। ঠিক।' সঙ্গীর দিকে ফিরল সে। 'কী বুঝলে জ্যাকি?'

'অ্যাঁ, হ্যাঁ!' ঘাড় চুলকাচ্ছে জ্যাকি। 'ঠিকই তো মনে হচ্ছে। তা হলে, খোকা, এবার ফাঁস করো তো, কোথায় আছে অকটেভিয়ান?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কার কাছে জানি বিক্রি করে দিয়েছে চাচী। কে কী কিনল, নাম ধাম তো আর লিখে রাখা হয় না, জানাও সম্ভব না। তবে, লস অ্যাঞ্জেলেসের কেউই হবে।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাইস, আনমনে গোঁফের মাথা ধরে টান মারল। খানিকটা সরে গেল গোঁফ। নকল! 'হুঁ! আরেকটা কথা বল তো, অকটেভিয়ানের ভেতরেই যদি থাকবে তুমি মূর্তিটা খুঁজছ না কেন? এ-বাড়িতে কী খুঁজতে এসেছ?

জবাব দেয়া কঠিন। কিশোরের...ভাব ছিল, যে কোনটার জিনিস নিয়ে এত গোলমাল, ওই লোক কোনবাড়িতে বাস করত, দেখা দরকার। কী জিনিস, বা কী ধরনের সূত্র খুঁজতে এসেছে, সে নিজেও জানে না।

'অকটেভিয়ান কোথায় আছে জানি না,' বলল কিশোর। 'তাই ভাবলাম, এখানেই খোঁজখবর করে যাই। নতুন কিছু মিলেও যেতে পারে।'

'নতুন কী?'

'নতুন ঠিক না, ভাবলাম, মানে আমার ভুলও হতে পারে, হয়তো অকটেভিয়ানের ভেতরেও লুকানো নেই পাথরটা। এ-বাড়িতেই কোথাও লুকিয়েছেন মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট।'

'না, এখানে নেই,' বিড়বিড় করল রাইস। 'তা হলে মেসেজে লেখা থাকত। নকলটা অগাসটাসের ভেতরে ছিল, তারমানে আসলটা অকেটেভিয়ানেই আছে। এখন তা হলে ওই মূর্তিটাই তাড়াতাড়ি খোঁজা দরকার, আর কেউ জেনে যাওয়ার আগেই।'

'কোথায় খুঁজব?' প্রশ্ন করল জ্যাকি। 'এক এক করে বাড়ি খুঁজতে শুরু করলে, সারা জীবন খুঁজেও লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ওটা বের করতে পারব না।'

'হ্যাঁ, একটা সমস্যা বটে,' মাথা দোলাল রাইস। কিশোরের চোখে চোখে তাকাল, 'সেটা কি আমাদের সমস্যা? মোটেও না। মুক্তি পেতে চাইলে উপায়টা তোমাকেই বাতলাতে হবে। ভাবো।'

চুপ করে রইল কিশোর। ভূত-থেকে-ভূতের কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু ওটা তাসের শেষ ট্রাম্প। এখনই হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

'অকটেভিয়ান কোথায় জানি না,' বলল কিশোর। 'তবে আমাকে ছেড়ে দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি, খুঁজে বের করা যায় কিনা।'

'কীভাবে করবে, উপায়টা বলো,' কুৎসিত হাসি হাসল জ্যাকি। 'এখনও না জানলে, ভেবে বের করো, এখানে বসেই। সারাদিন বসে থাকতেও রাজি আছি আমরা। দরকার হলে সারা রাত। তোমার বন্ধুরা ভাঁড়ারে আটকে আছে, ভুলে গেছ?'

জবাব নেই কিশোরের। কী বলবে? ভাবনার তুফান চলেছে মগজে। ওরা এখানে বন্দি হয়েছে এটা কি অনুমান করতে পারছে রবিন? রাতে যদি বাড়ি না

ফেরে ওরা তিনজন, বোরিসকে নিয়ে কী আসবে? রবিনকে ফোনের পাশে থাকতে বলে এসেছে সে, তাই তাড়াহুড়ো করবে না রবিন। কিন্তু বেশি দেরি হয়ে গেলে? চাচা-চাচীও যখন চিন্তিত হয়ে পড়বেন?

ভূত-থেকে-ভূতের কথা বলল না কিশোর। অপেক্ষা করবে, সিদ্ধান্ত নিল। হয়তো রবিন...

এই সময় দরজায় দেখা দিল আবার হ্যারিসন। 'রেডিও,' জ্যাকি আর রাইসকে বলল সে। 'আপনাদের বন্ধুরাই বোধহয়, রেডিওতে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। জ্যাকি নামটা শুনলাম...'

পাঁই করে ঘুরল রাইস। 'রেডিও।' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ভুলেই গিয়েছিলাম। জ্যাকি, যাও তো, নিশ্চয় জিকো। ওদিকে খবর-টবর আছে বোধহয়।'

ছুটে বেরিয়ে এল জ্যাকি।

কিশোর অবাক! মৃত লোক রেডিওতে কথা বলে কী করে? তিন-ফোঁটা না ছুরি মেরে মেরে ফেলেছে তাকে?

বড় আকারের একটা ওয়াকি-টকি নিয়ে ফিরে এল জ্যাকি। একদিকে কাত হয়ে পড়েছে সে, বোঝাই যাচ্ছে, বেজায় ভারি। ছোট যে জিনিস ব্যবহার করে তিন গোয়েন্দা, তার চেয়ে অনেক ভাল আর দামী এটা, অনেক বেশি শক্তিশালী। লাইসেন্স লাগে। আছে কিনা কে জানে? সেটা নিয়ে জ্যাকি আর রাইসের মত লোক বিশেষ মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না।

'জিকো-ই,' ঘোষণা করল জ্যাকি। রেডিওটা মেঝেতে রেখে একটা বোতাম টিপে ধরল। মুখ নামিয়ে বলল, 'জিকো, জ্যাকি বলছি। শুনতে পাচ্ছ?' ছেড়ে দিল বোতামটা।

গুঞ্জন উঠল রেডিওর স্পীকারে। কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ, কেমন যেন যান্ত্রিক, একবার আওয়াজ কমছে, একবার বাড়ছে, দূর থেকে আসছে বলেই। 'জ্যাকি, কোথায় তোমরা? দশ মিনিট ধরে চেষ্টা করছি।'

'আমরা ব্যস্ত। কী খবর?'

'এদিকে উত্তেজনা। সোনালিচুলো ছেলেটা এইমাত্র পিকআপ নিয়ে বেরোল, সঙ্গে ড্রাইভার। ইয়ার্ডেরই একজন। হলিউডের দিকে চলেছে, আমরা পিছু নিয়েছি।'

ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। তাদেরকে খুঁজতে আসছে রবিন। বোরিসকে নিয়ে আসছে? জ্যাকি আর রাইসকে সামলাতে বোরিস একাই যথেষ্ট...

কিন্তু তার পরের কথা শুনেই আশা দপ করে নিভে গেল তার।

'এদিকে আসছে?' জ্যাকি বলল।

'না, শহরের দিকে যাচ্ছে। আমরা পিছু নিয়েছি, জানে না।'

'দেখো, কোথায় যায়,' নির্দেশ দিল জ্যাকি। রাইসের দিকে তাকাল। 'তুমি কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। অকটেভিয়ানের খোঁজ পেয়েছে ছেলেটা, আমি শিওর। জিকোকে বলো,

যদি কোন মূর্তি পিকআপে তোলা হয়, ওটা ছিনিয়ে নেয় যেন।'

নির্দেশ জানাল জ্যাকি রেডিওতে। তারপর সুইচ অফ করে হাসল রাইসের দিকে চেয়ে। 'রেডিওটা কিনে খুব ভাল করেছ। টাকা উসুল।' বকের মত গলা বাড়িয়ে কিশোরের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল সে। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে খুশিতে। 'এবার বসে বসে শুধু দেখার পালা, কী বলো, খোকা বাবু?'

তেরো

বিকেল হয়ে এসেছে, তবু কিশোর আর মুসার দেখা নেই। আর অপেক্ষা করতে পারছে না রবিন। হয়তো জরুরী কোন ব্যাপারে আটকে গেছে ওরা, ওদের জন্যে বসে থাকলে অকটেভিয়ানকে হারাতে হতে পারে। মনস্থির করে ফেলল রবিন, ওদেরকে ছাড়াই যাবে।

মেরীচাচীকে জিজ্ঞেস করল সে, পিকআপটার কোন দরকার আছে কিনা। নেই। বোরিসের হাতেও টুকটাক কাজ, পরে করলেও চলবে। একবার দ্বিধা করেই রাজি হয়ে গেলেন মেরিচাচী।

চাচীর কাছ থেকে পঞ্চাশ ডলার ধার নিল রবিন, যদি আর কোন মূর্তি নিতে রাজি না হন মহিলা, যিনি অকটেভিয়ান কিনেছেন, তাঁকে দিতে হবে। তবুও ফ্রান্সিস বেকনকে সঙ্গে নিল।

পিকআপের পিছনে পুরু করে ক্যানভাস বিছিয়ে তাতে মূর্তিটা ভালমত বসাল বোরিস, যাতে গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়ে গিয়ে নষ্ট না হয়ে যায়। চারদিক ঘিরে পুরানো খবরের কাগজের গাদা আর কার্ডবোর্ডের বাক্স গুঁজে দিল এমনভাবে, হাজার ঝাঁকুনিতেও পড়া তো দূরের কথা, নড়বেও না মূর্তি।

ইয়ার্ড থেকে কম করে হলেও পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। আবাসিক এলাকার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে সুন্দর পথ, মসৃণ গতিতে ছুটে চলল পিকআপ। পথ ভাল, ঘন লোকালয়ের ভিতর দিয়ে গেছে, ফলে গাড়ির ভিড়ও বেশি। ওদেরকে অনুসরণ করে আসছে একটা গাঢ় নীল সিড্যান, এটা লক্ষই করল না রবিন কিংবা বোরিস। গাড়িটাতে দুজন লোক, দুজনেরই কালো গোঁফ, হর্ন-রিমড ভারি চশমা।

যে অঞ্চলের ঠিকানা দিয়েছে মেয়েটা, সেখানে পৌঁছে গেল পিকআপ। গলির নাম্বার দেখতে শুরু করল রবিন। গলি পাওয়া গেল। মোড় নিয়ে গাড়ি ঢোকাল বোরিস।

'এই যে, এই বাড়িই!' চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'রাখুন, রাখুন।'

'হো-কে,' রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে ব্রেক কষল বোরিস। গাড়ি থামাল। ওদের আধ ব্লক পেছনে থেমে গেল নীল সিড্যান। গাড়িতেই বসে রইল লোক দুজন, এদিকে দৃষ্টি।

এক পাশের দরজা খুলে নেমে পড়ল রবিন, অন্য পাশ দিয়ে বোরিস। ট্রাকের পেছন থেকে মূর্তিটা তুলে নিয়ে এগোল রবিনের পিছু পিছু।

বেল বাজাল রবিন।

দরজার ওপাশেই যেন অপেক্ষা করছিল মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল,

বয়েসে রবিনের চেয়ে ছোট হবে।

'তিন গোয়েন্দা!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, জীবন্ত শার্লক হোমসকে দেখছে যেন সামনে।

'তিন গোয়েন্দায় যোগ দিয়েছে বলে গর্ব হলো রবিনের। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল সামান্য।'

'অকটেভিয়ানকে নিতে এসেছ?' কথার তুবড়ি ছুটল মেয়েটার মুখ দিয়ে। 'মা যেটা কিনে এসেছে? রহস্যময় কোন গোপন কারণ আছে নিশ্চয়? এসো। ইস্, মাকে রুখতে জান বেরিয়ে যাচ্ছিল আমার! প্রায় দিয়েই দিয়েছিল পড়শীকে। শেষে বললাম, ভুল করে রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ দিয়ে প্রলেপ লাগানো হয়েছে মূর্তিটায়, মারাত্মক পদার্থ, সিকিউরিটির লোক নিতে আসছে, তবে গিয়ে থামল। নইলে দিয়ে ফেলেছিল।'

এত দ্রুত কথা বলে মেয়েটা, শুনে তাল রাখাই মুশকিল হয়ে গেল রবিনের পক্ষে। চোখ পিটপিট করছে বোরিস।

'আরে এসো, এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' বলেই ঘুরল মেয়েটা।

তাকে অনুসরণ করল রবিন আর বোরিস।

বাড়ির পেছনে সুন্দর একটা বাগানে ওদেরকে নিয়ে এল মেয়েটা। মাঝখানে একটা ফোয়ারার ধারে রয়েছে অকটেভিয়ান, দেখেই এক লাফ মারল রবিনের হৃৎপিণ্ড। অকটেভিয়ানের গায়ে ছায়া ফেলেছে উঁচু গোলাপঝাড়, সবুজ পাতার মাঝে মাঝে ফুটে রয়েছে লাল গোলাপ, ধুলোয় মলিন সাদা মূর্তিটাকে এই পরিচ্ছন্নতার মাঝে বড় বেমানান, বড় নোংরা দেখাচ্ছে।

খানিক দূরে মরা পাতা ছাঁটছেন একজন হালকা-পাতলা মহিলা, সাড়া শুনে ঘুরলেন।

'এই যে, মা, ওরা এসে পড়েছে,' আবার কথা শুরু করে দিল মেয়েটা। 'তিন গোয়েন্দার লোক। বলেছিলাম না? ও ওদেরই একজন,' রবিনকে দেখাল সে। 'অকটেভিয়ানকে নিতে এসেছে। আর কোন ভয় নেই তোমার। এখনও ছুঁয়ে ফেলোনি তো? বেশ বেশ, তা হলে আর ভয় নেই। আরিব্বাপরে, রেডিও অ্যাকটিভ! স্কুলের আপা বলেছে, সাংঘাতিক ক্ষতি করে শরীরের...'

'না, ছুঁইনি, রুসা!' মেয়েকে থামিয়ে দিলেন মহিলা। রবিনের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। 'যত সব উদ্ভট কল্পনা মেয়েটার, ফ্যানটাসির জগতে বাস। ওর চোখে দুনিয়ার সবই রহস্য, রাস্তার অচেনা সমস্ত লোক চোর-ডাকাত কিংবা স্পাই। নিশ্চয় বলেছে, রেডিও অ্যাকটিভিটির কথা বলে আমাকে ঠেকিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা নোয়াল রবিন। 'মূর্তিটা নিতে এসেছি, ম্যাডাম। ওটার বদলে যদি আরেকটা চান...এই যে, ফ্র্যানসিস বেকন...'

'না, আর মূর্তির দরকার নেই। ভেবেছিলাম, বাগানে রাখলে ভাল লাগবে। কিন্তু লাগে না। নিজেই তো দেখছ।'

'হুঁ!' পকেট থেকে টাকা বের করে বাড়িয়ে ধরল রবিন, 'এই নিন, পঞ্চাশই আছে।'

'খুব ভাল, খুব ভাল,' খুশি হলেন মহিলা। 'প্যাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের সুনাম শুনেছিলাম, দেখছি ঠিকই শুনেছি।'

'বোরিস,' রবিন বলল, 'দুটো মূর্তি একসঙ্গে নিতে পারবেন?'

'পারব,' একটা মূর্তি বগলে চেপে ধরে রেখেছে বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। কিশোর বলে, ওর গায়ে মোষের জোর, ঠিকই বলে। অকটেভিয়ানকে আরেক বগলের তলায় তুলে নিল বোরিস অতি সহজে, যেন তুলোর পুতুল। রবিনের দিকে ফিরল। 'যাব?'

'হ্যাঁ, চলুন,' ঘুরে দাঁড়াতে গেল রবিন।

দুই লাফে কাছে চলে এল রুসা। এখুনি চলে যাবে? এই প্রথম সত্যিকারের একজন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা হলো, কয়েক কোটি প্রশ্ন জমে আছে মনে, জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম...'

'কী...,' দ্বিধা করছে রবিন। রুসার কথা শুনতে মন্দ লাগছে না। তা ছাড়া, গোয়েন্দাদের ওপর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা যখন মেয়েটার... বোরিসের দিকে তাকাল সে। 'আপনি যান আমি আসছি। হ্যাঁ, অকটেভিয়ানকে একটা বাক্সে ভরে রাখবেন।'

'ঠিক আছে, তুমি তাড়াতাড়ি এসো,' বলে হাঁটতে শুরু করল বোরিস।

কথার মেশিনগান ছোটাল রুসা, একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে, কোনটারই জবাবের অপেক্ষা করছে না। কিছুই বলতে হচ্ছে না রবিনকে, শুধু শুনছে।

বোরিস এসে উঠল পিকআপের পেছনে। চ্যাপ্টা হয়ে থাকা কার্ডবোর্ডের বড় একটা বাক্স ঠিকঠাক করে তার মধ্যে একটা মূর্তি ঢুকিয়ে ভাল মত বাঁধল। তার প্রতিটি কাজের ওপর চোখ রেখেছে নীল সিড্যানে বসা দুই কালো-গুঁফো। রেডিওতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে জিকো, জ্যাকি আর রাইসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে।

'মূর্তি বাক্সে ঢুকিয়ে বেঁধেছে ভালুকটা,' মাইক্রোফোনে মুখ প্রায় ঠেকিয়ে কথা বলছে জিকো। ছেলেটা এখনও বাড়ির ভেতরে...

ভাঙা চেয়ারে বসে সব শুনছে কিশোর।

কথা শেষ হলো জিকোর। নির্দেশ দিল রাইস, 'বাক্সটা নামাও! শোনো, এক কাজ করো। একটা নকল দুর্ঘটনা ঘটাও। পিকআপটা স্টার্ট নিলেই গিয়ে ওটার সামনে দাঁড়িয়ে যাও, চলতে শুরু করলেই পড়ে যাওয়ার ভান করবে, ধাক্কা খেয়ে যেন পড়ে গেছ। চেঁচাতে শুরু করবে। লোকজন জমে যাবে। ছেলেটা আর ড্রাইভার নেমে পড়বে কতখানি চোট লেগেছে দেখার জন্যে। এই সুযোগে...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, দরকার নেই!' চেঁচিয়ে বাধা দিল জিকো। 'ভালুকটা আবার বাড়ির ভেতরে যাচ্ছে। ট্রাকে কেউ নেই। নামিয়ে আনতে পারব।'

নীরব হয়ে গেল রেডিও। পারছে না তাই, নইলে দড়ি ছিঁড়ে উড়ে চলে যেত এখন কিশোর। যা-ও বা অকটেভিয়ানের মূর্তিটা খুঁজে পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই হারাতে হচ্ছে আবার।

বাগানে এসে ঢুকল আবার বোরিস।

একনাগাড়ে বকে চলেছে মেয়েটা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে রবিন।

'আচ্ছা, মেয়ে গোয়েন্দার দরকার নেই তোমাদের?' আগ্রহে সামনে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে রুসা। 'আমার তো মনে হয়, দলে একটা মেয়ে থাকা উচিত। অনেক সময় অনেক রকম সাহায্য হবে, যা ব্যাটাছেলেকে দিয়ে হয় না। আমাকে নিতে পারো। খুব ভাল অভিনয় করতে পারি, বিশ্বাস না হলে মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, যে কোন মানুষের গলা নকল করতে পারি, আর...'

'এই রবিন,' ডাকল বোরিস। 'আর কতক্ষণ! মিসেস পাশা জলদি করতে বলে দিয়েছে। চলো।'

'হ্যাঁ, এই যে, আসছি,' রবিন বলল। 'সরি, রুসা, আমাকে যেতে হচ্ছে। হয়তো মেয়ে একজন দরকার হতে পারে আমাদের। যদি হয়, তোমাকেই আগে খবর দেব।'

'এক সেকেন্ড, প্লীজ! আমি আসছি,' রবিনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ছুটে বাড়ির ভিতরে চলে গেল রুসা। ফিরে এল যেন চোখের পলকে। হাতে একটা চারকোনা সাদা কার্ড, আর পেনসিল। 'এই যে, নাও, ফোন নম্বর আর আমার নাম লিখে দিয়েছি। প্লীজ, রবিন, ভুলো না! আমাকে খবর দিয়ো। সত্যিকার গোয়েন্দাদের সঙ্গে কাজ করতে পারলে ধন্য হয়ে যাব। প্লীজ!'

কার্ডটা হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল রবিন, তার পাশে বকবক করতে করতে চলল মেয়েটা।

ট্রাকে এসে উঠল রবিন আর বোরিস। ঘুরে গলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন নীল সিড্যান, দেখল দুজনেই, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হলো না, বাক্সে বাঁধা মূর্তি চলে যাচ্ছে।

হাত নেড়ে গুড-বাই জানাল রুসা। কিশোর আর মুসাকে নিয়ে আরেকদিন এসে চা খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল চেঁচিয়ে।

গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস।

মোড় নিয়ে বড় রাস্তায় পড়ার আগে জানালা দিয়ে মুখ বের করে পেছনে তাকাল রবিন, এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে রুসা, রবিনকে দেখে আরেকবার হাত নাড়াল।

চুপ হয়ে গিয়েছিল, আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও। কানে এল জিকোর গলা।

'পেয়েছি!' জিকো বলছে। 'ওরা কল্পনাও করতে পারেনি, মূর্তিটা আমরা নিয়ে এসেছি।'

'গুড!' বলল রাইস। 'গোপন আড্ডায় নিয়ে যাও। খবরদার, আমরা আসার আগে খুলো না। ওভার অ্যান্ড আউট।'

'ওভার অ্যান্ড আউট!' বলে নীরব হয়ে গেল রেডিও।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল রাইস, বিচ্ছিরি হাসি, ঠোঁটের এক কোণ ঝুলে পড়ছে। 'খোকা, বেঁচে গেলে। আমাদের জিনিস আমরা পেয়েছি। এখুনি অবশ্য তোমাদেরকে ছাড়তে পারছি না, তোমার বাড়িতে ফোন করে খবর দেব কোথায় আছ। তবে দেরি হবে, রাতের আগে বোধহয় পারব না। ততক্ষণ বসে থাকো এখানে।'

হ্যারিসনকে ডাকল রাইস।

তারপর তিনজনে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে একবার ফিরে তাকাল হ্যারিসন, কিশোরের জন্যে কিছু করতে পারেনি বলে দুঃখিত মনে হচ্ছে ওকে। বুড়ো মানুষ, দুই ডাকাতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না বোঝাই যাচ্ছে।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর মিনিটখানেক অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, 'মুসাআ! গাআস! শুনছও!'

'কিশোওর!' মুসার চাপা কণ্ঠ ভেসে এল, দুটো বন্ধ দরজার জন্যে আওয়াজ অস্পষ্ট। 'কী হচ্ছে? আমাদের বের করতে পারবে? লাইটের ব্যাটারি শেষ!'

'সরি, সেকেন্ড!' জবাব দিল কিশোর। 'আমি নিজেই আটকে আছি। দড়ি পেঁচিয়ে মমি বানিয়ে রেখেছে আমাকে। অকটেভিয়ানকেও পেয়ে গেছে ওরা!'

চোদ্দ

ভাবছে কিশোর, কী করে মুক্তি পাওয়া যায়! জানালার চৌকাঠে ফেলে গেছে ওরা তার ছুরিটা। ওখানে যাওয়া সম্ভব না, আর কোন অলৌকিক উপায়ে যেতে পারলেও দড়ি কাটা তো দূরের কথা, ওটা হাতে নিতে পারবে না।

কিন্তু মুক্তি তো পেতেই হবে! ওরা বলে গেছে বটে। কিন্তু কখন ফোন করবে না করবে ঠিক আছে?

নীচে জোর ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। বন্ধ দরজায় গায়ের জোরে ধাক্কা মারছে মুসা আর অগাস্ট, তারই আওয়াজ। ভেঙে ফেলতে চাইছে পাল্লা।

ধাক্কা দেয়া থামল। চিৎকার শোনা গেল মুসার, 'কিশোর, এই কিশোর! শুনছ?'

'শুনছি!' জবাব দিল কিশোর। 'কী খবর!'

'নড়ছেও না। কাঁধ ব্যথা করে ফেলছি আমরা! ভীষণ অন্ধকার!'

'ধৈর্য ধরো। উপায় ভাবছি আমি।'

'জলদি করো, কিশোর! হুটোপুটি শুনছি, ইঁদুর আছে মনে হয়!'

চিমটি কাটতে পারছে না, নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেই গভীর ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর। একটা কোন উপায়! একটা! চেয়ারে নড়েচড়ে উঠল সে, তার চেয়ে বেশি নড়ল চেয়ারটা, বিচিত্র শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল যেন।

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে কিশোর, বাইরে সময় যেন ছুট লাগিয়েছে। একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে। পশ্চিমের উঁচু চূড়ার ছায়া এসে পড়েছে লনে, সূর্য যতই দিগন্তে নামছে, ততই বাড়ছে ছায়াটা।

টেনেটুনে আরেকবার হাতের বাঁধন পরীক্ষা করল কিশোর। কচমচ, মড়মড় করে উঠল আবার চেয়ার। বিদ্যুৎ ঝিলিক হানল যেন তার মগজে। মনে পড়ল, কিছুদিন আগে পুরানো নড়বড়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল সে, মড়াৎ করে ভেঙে প্রায় বসে গিয়েছিল চেয়ারটা।

শরীরটা সামনে পেছনে করতে শুরু করল কিশোর, চেয়ারও নড়ছে তার সঙ্গে। জোড়াগুলো খুলবে খুলবে করছে, কিন্তু খুলছে না। ঝটকা মেরে, এক পাশে কাত

হয়ে গেল কিশোর, চেয়ার নিয়ে পড়ল ধ্রাম করে। চেয়ারের একটা পায়া ছুটে গেল। কয়েকবার জোরে জোরে পা ছুঁড়তেই খুলে উড়ে চলে গেল পায়াটা, কিশোরের পায়ে দড়ির প্যাঁচগুলো ঢলঢলে হয়ে গেল। যাক, ডান পা-টা মুক্তি পেল!

অন্য পা মুক্ত করার চেষ্টায় লাগল কিশোর। টানাহেঁচড়া করে লাভ হলো না। শেষে ডান পায়ে ভর দিয়ে উঠে তিন পায়ার ওপর বসাল চেয়ারটাকে, ধাক্কা দিয়ে কাত হয়ে চেয়ার নিয়ে পড়ল আরেক পাশে। মড়াৎ করে বাঁ হাতটা ভাঙল চেয়ারের। নিজেও ব্যথা পেয়েছে কিশোর, গুঙিয়ে উঠল। কিন্তু চুপ করল না। হ্যাঁচকা টান মারল বাঁ হাতে, জোড়া থেকে খুলে এল চেয়ারের বাঁ হাতা। হাতটা বার বার ঝাঁকি দিয়ে হাতা খুলে ফেলার চেষ্টা করল।

'কিশোর!' মুসার উদ্বিগ্ন ডাক শোনা গেল। 'কী হয়েছে? মারপিট করছ?'

'হ্যাঁ, চেয়ারের সঙ্গে,' জবাব দিল কিশোর। 'আমি জিতছি। আর মিনিট দুই অপেক্ষা করো।'

উঠে আবার চেয়ার নিয়ে কাত হয়ে পড়ল কিশোর, মড়মড় করে উঠল চেয়ার, বেঁকাতেড়া হয়ে গেল, কিন্তু আর কোন জোড়া খুলল না। অনেক কায়দা-কসরৎ করেও বাঁ হাত থেকে চেয়ারের হাতা খসাতে পারল না সে। চেষ্টা করে দেখল, হামাগুড়ি দেয়া যায়, শেষে হামাগুড়ি দিয়েই এগোল জানালার দিকে ছুরিটার জন্যে।

দুই হাতেরই কব্জি অবধি বাঁধা, আঙুলগুলো নড়ানো যায়। জানালার চৌকাঠ থেকে বাঁ হাতে ছুরিটা তুলে নিতে পারল কিশোর। ব্যস, হয়ে গেছে কাজ! বাঁধন কেটে মুক্ত হতে আর মাত্র এক মিনিট লাগল।

প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে, মেঝেতেই চিত হয়ে শুয়ে জিরিয়ে নিল কিশোর। ডেকে বলল, 'মুসা, আমি আসছি।'

'আল্লাহ্!' অনেকক্ষণ অন্ধকারে থেকে আলোয় এসে চোখ মেলতে পারছে না মুসা। 'দড়ি খুললে কী করে?'

'মগজের ধূসর কোষগুলোকে ব্যবহার করে,' মাথায় টোকা দিল কিশোর। 'চলো, জলদি কাটি এখান থেকে। কোন কারণে কালো-গুঁফোদের কেউ আবার এসে পড়লেই গেছি। রবিনের খবর শোনো, অকটেভিয়ানকে খুঁজে পেয়েছে...'

'তাই নাকি?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'ভাল খবর!' যোগ করল অগাস্ট।

'কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়েছে আবার,' আগের বাক্যটা শেষ করল কিশোর। 'কালো-গুঁফোরা নিয়ে গেছে। চলো, যেতে যেতে বলব।'

সাইকেলগুলো তেমনি পড়ে আছে। তুলে নিয়ে চড়ে বসল তিনজনে, দ্রুত ফিরে চলল রকি বীচে। যাওয়ার পথে সব খুলে বলল কিশোর।

'ইশ্‌শ্, বার বার এসেও আবার চলে যাচ্ছে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে!' বিলাপ করে উঠল যেন মুসা। 'মূর্তিটায় জিনের আসর হয়েছে।'

'বোধহয় অভিশাপই কাটেনি এখনও,' মন্তব্য করল অগাস্ট।

'না কাটলে আমাদের কী? কালো-গুঁফোরা মরবে,' কিশোর বলল। 'আমি অবাক হচ্ছি জিকোর কথা ভেবে। তিন-ফোঁটা বলল ওকে মেরে ফেলেছে, তা হলে

আবার এল কোত্থেকে?'

'হুঁ, রহস্যই!' মুসা ঘাড় দোলাল। 'কিন্তু ওসব ভাবনা তো পরে, আবার অকটেভিয়ানকে পাচ্ছি কী করে? গাস, তোমার সম্পত্তি বোধহয় গেল।'

তিনজনেই চিন্তিত। কথা জমল না। চুপচাপ সাইকেল চালিয়ে রকি বীচে এসে পৌঁছল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ইয়ার্ডের গেটে ঢুকে মনে পড়ল ওদের, সারাদিন কিছু খায়নি, মনে পড়তেই মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভেতর।

রবিন, বোরিস আর রোভার, তিনজনেই কাজে ব্যস্ত। চাচা-চাচীকে দেখা যাচ্ছে না। ইয়ার্ডের শেষ মাথায় বড় বড় গাছের গুঁড়ি একটার ওপর আরেকটা তুলে রাখছে দুই ব্যাভারিয়ান। পিকআপটা দাঁড়িয়ে আছে অফিসের কাছে। কয়েকটা লোহার চেয়ারে রঙ করছে রবিন।

'মন খারাপ নথির,' বলল মুসা। 'দেখেছ, ব্যাজার হয়ে আছে?'

'আমাদেরও তো তাই,' কিশোর বলল।

সাইকেলের শব্দ শুনে মুখ তুলল রবিন। জোর করে হাসার চেষ্টা করল। 'এই যে, এসেছ। ভেবেই মরছিলাম, কোথায় গেছ!'

'গাসের দাদার বাড়িতে,' সাইকেলটা স্ট্যান্ডে তুলতে তুলতে বলল কিশোর। 'তোমার কী খবর?'

'ইয়ে...' বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন, এতবড় একটা দুঃসংবাদ শোনাতে বাধছে।

'ঠিক আছে, বলতে হবে না,' কণ্ঠে রহস্য ঢালল কিশোর। 'এদিকে এসো।...আমার চোখে চোখে তাকাও। হ্যাঁ, না না, পাতা বন্ধ কোরো না। তোমার চোখ দেখেই বলে দিতে পারব মনে কী আছে।'

মিটিমিটি হাসছে মুসা আর অগাস্ট।

রবিনের চোখে কিশোরের দৃষ্টি স্থির, আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে নিজের কপালে। 'হ্যাঁ, আসছে...পড়তে পারছি—ফোন এসেছিল, এক ভূত ফোন করেছিল। অকটেভিয়ানের খোঁজ মিলেছে। পিকআপ আর বোরিসকে নিয়ে ছুটলে। তারপর...তারপর, মূর্তিটা পেলে, গাড়িতে তুললে! হলিউডের এক বাড়িতে পেয়েছ, ঠিক হচ্ছে না?'

হাঁ হয়ে গেছে রবিন। 'তাই হয়েছে! কিন্তু...'

'চুপ!' আঙুল তুলল কিশোর। 'বাকিটাও পড়ছি...'

রবিন আরও অবাক, দেখে, অগাস্টও হাসছে। কিশোরও। কিছুই বুঝতে না পেরে সে-ও হাসল। গোমড়া ভাবটা কেটে গেল, হালকা হয়ে গেল আবার পরিস্থিতি।

'রবিন?' বোরিসের ডাক শুনে ঘুরল চার কিশোর, পিকআপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাভারিয়ান। 'মূর্তিটা কী করব? পিকআপ গ্যারেজে তুলতে হবে।'

'ওই বেঞ্চে রেখে দিন,' রবিন বলল। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'ফ্র্যানসিস বেকন। নিয়ে গিয়েছিয়াম যদি মহিলা বদলে নেন! নিলেন না, টাকাই ফেরত নিলেন। পঞ্চাশ ডলার ধার নিয়েছিলাম মেরিচাচীর কাছ থেকে, অকটেভিয়ানকে ফেরত আনতে পারলে টাকাটা আর দিতে হত না।'

'ও নিয়ে ভেবো না,' হাত নাড়ল কিশোর। 'টাকার ব্যবস্থা আমি করব।'

মূর্তিটা নামিয়ে বেঞ্চে রাখল বোরিস।

কোন কিছু না ভেবেই এগিয়ে গেল মুসা। কাছে গিয়ে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! ঠিক দেখছি তো! এই কিশোর, জলদি এসো!'

ছুটে এল তিন কিশোর।

আঙুল তুলে মূর্তির পিছনের লেখা দেখাল মুসাঃ অকটেভিয়ান!

'অকটেভিয়ান!' চেঁচিয়ে উঠল অগাস্ট। 'কালো-শুঁফোর দল নিতে পারেনি!'

'বুঝেছি!' ঘোরের মধ্যেই যেন মাথা দোলাল রবিন। 'দুটো মূর্তি বগলে চেপে নিয়ে গিয়েছিল বোরিস, অকটেভিয়ানকে বাক্সে না ভরে, ভুলে বেকনকে ভরেছে। যাক, বাঁচলাম!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

চট করে সবাই একবার দেখে নিল গেটের দিকে, তাদের ভয়, তিন-ফোঁটা না এসে হাজির হয় আবার। অমূলক ভয়, একেবারে নির্জন গেট আর রাস্তা।

কমবেশি সবাই চমকে গিয়েছে, আগে সামলে নিল কিশোর। 'চলো, চলো, দেরি করা উচিত না। ওয়ার্কশপে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলি মূর্তিটা।'

জোশ এসে গেছে মুসার শরীরে, একাই মূর্তিটা বয়ে নিয়ে এল ওয়ার্কশপে।

একটা বাটালি আর হাতুড়ি বের করে আনল কিশোর। 'দেখো,' অকটেভিয়ানের ঘাড়ের নীচে হাত বোলাচ্ছে সে। 'এখানে গর্ত করা হয়েছিল, তারপর আবার কাদা লেপে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আঙুলে লাগছে। যাক, অবশেষে রক্তচক্ষু মিলল!'

'দূর, কথা থামাও!' অধৈর্য হয়ে বাতাসে থাবা মারল মুসা। 'ভাঙো, ভাঙো! নইলে আমার কাছে দাও!'

হেসে মূর্তির গায়ে বাটালি লাগাল কিশোর, হাতুড়ি দিয়ে জোরে বাড়ি মারল বাটালির পেছনে। আরেকবার বাড়ি মারতেই চলটা উঠে গেল, পরের বাড়িতে অকটেভিয়ান দু'টুকরো। ছোট গোল একটা কাঠের বাক্স গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিল মুসা। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'খোলো! তুমিই খোলো! দেখি, পঞ্চাশ বছর ধরে কী জিনিস লুকিয়ে রেখেছে!' উত্তেজনায় কাঁপছে তার গলা। 'আরে, দেরি করছ কেন? অভিশাপের ভয় করছ নাকি?'

'না,' কেমন বদলে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠ! 'হালকা! এত হালকা হওয়ার তো কথা না!' বাক্সটা হাতের তালুতে রেখে ওজন আন্দাজ করছে সে।

মোচড় দিয়ে বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলল কিশোর। সবাই ঝুঁকে এল ভেতরে কী আছে দেখার জন্যে। না, জ্বলজ্বলে লাল কোন পাথর তো নেই! শুধু রয়েছে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ। ধীরে, অতি ধীরে দু'আঙুলে চেপে কাগজটা বের করে আনল গোয়েন্দাপ্রধান। খুলে পড়লঃ 'গভীরে খোঁড়ো! সময় খুব মূল্যবান!'

পনেরো

সে-রাতে সহজে ঘুম এল না রবিনের চোখে। ভয়ানক উত্তেজনা গেছে সারা দিন। অবশেষে কী মিলল! এক টুকরো কাগজ! নাহ্, অতিরিক্ত হয়ে গেছে! বাক্সটা

খোলার পর কী কী ঘটেছে, বার বার চোখের সামনে ভাসছে তার।

হতাশ দৃষ্টিতে কাগজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে ছিল কিশোর। ও নিশ্চিত ছিল, বাক্সে পাথরটাই মিলবে। তার ধারণা ভুল। এবং ভুল হলে নিজের ওপর সাংঘাতিক রেগে যায় গোয়েন্দাপ্রধান।

'আরেকটা মেসেজ!' সবচেয়ে কম হতাশ হয়েছে মুসা।

'গভীরে খোঁড়ো!' আপনমনেই বলল কিশোর। 'মানে কী? রহস্যের গভীরে খোঁড়ো। লোককে বিপথে চালিত করার জন্যেই মূর্তির বুদ্ধি করেছেন হোরাশিও অগাস্ট। কিন্তু ধরে নিয়েছে, কোন না কোনভাবে বুঝে যাবে তাঁর নাতি। নিশ্চয় বোঝার জন্যে কোন ইঙ্গিতও রেখেছেন। সেটা কী?'

'জানি না,' জবাব দিল অগাস্ট। ভাঁজ পড়েছে দুই ভুরুর মাঝে। 'দাদা খুব চালাক ছিল, নিজের বুদ্ধির মাপকাঠিতেই আর সবাইকে বিচার করেছে, ফলে থই পাচ্ছি না আমরা।'

'দেখি, মেসেজটা বের করো তো,' হাত বাড়াল কিশোর। 'আছে সঙ্গে?'

বের করে দিল অগাস্ট।

ছোট টেবিলে ছড়িয়ে বিছিয়ে আবার মেসেজটা পড়ল কিশোর, জোরে জোরে।

'এখনও আমার কাছে আগের মতই দুর্বোধ্য!' ভ্রূকুটি করল মুসা।

'আমার কাছেও,' অগাস্ট বলল। 'অগাস্ট আমার সৌভাগ্য, মানে কী? অগাসটাসের কোন একটা মূর্তির ভেতরে, এ ছাড়া আর কী? কিংবা হতে পারে, অগাস্ট মাসের কথা বলেছে। আগামীকাল আমার জন্মদিন। অগাস্টের ছয় তারিখে বেলা আড়াইটায় জন্মেছি আমি। কিন্তু মাসের মধ্যে পাথর থাকে কী করে? কোন ক্যালেন্ডারের কথা বলেনি তো?'

'মনে হয় না,' নিজের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ তুলল। 'সব ভাবনাচিন্তা এখন বাদ। শুতে যাব। আচ্ছা, দাঁড়াও, দেখে নিই,' অকটেভিয়ানের মূর্তির ভাঙা ধারগুলো পরীক্ষা করে দেখল সে। বাক্সটা যেখানে ছিল, খাঁজ হয়ে আছে, আঙুল বুলিয়ে দেখল। 'মূর্তির ভেতরে পাথর রাখা নিরাপদ মনে করেননি মিস্টার অগাস্ট।'

চুপ করে রইল অন্য তিনজন। বলার আছেই বা কী?

'চলো যাই,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'পেটের ভেতর ছুঁচো নাচছে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ব। ঘুম দিয়ে উঠলে মাথাটা পরিষ্কার হবে, কোন একটা বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে হয়তো তখন।'

সাইকেল নিয়ে বাড়ি চলে এল রবিন। খাওয়ার পর খাওয়ার টেবিলে বসেই নোট লিখতে শুরু করল, সারা দিন যা যা ঘটেছে, বিস্তারিত। পরে খুঁটিনাটি সব মনে না-ও থাকতে পারে। লিখতে লিখতেই হাত থেমে গেল এই সময় হঠাৎ: ডায়াল ক্যানিয়ন! তাই তো, ডায়াল ক্যানিয়ন কেন? অদ্ভুত নাম! খানিক দূরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন মিস্টার মিলফোর্ড। ডেকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'বাবা, হলিউডের উত্তরে ডায়াল ক্যানিয়নের নাম শুনেছ?'

কাগজ নামিয়ে রাখলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'ডায়াল ক্যানিয়ন? বোধহয় শুনেছি। কেন?'

'নামটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে!'

'তাই, না? দাঁড়া দেখছি।' উঠে গিয়ে বুকশেলফ থেকে মোটা একটা বই নিয়ে এলেন মিস্টার মিলফোর্ড, আর একটা বড় ম্যাপ।

ম্যাপে পাওয়া গেল জায়গাটা। আঙুল রেখে বললেন, 'এই তো।' বইটা খুললেন। 'ডায়াল ক্যানিয়ন...ডায়াল ক্যানিয়ন...এই যে, নিঃসঙ্গ ছোট্ট একটা গিরিসঙ্কট, হলিউডের উত্তরে। আগে নাম ছিল সানডায়াল ক্যানিয়ন, পরে সংক্ষেপ করে নেয়া হয়েছে। এই নামকরণের কারণ, সূর্যঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চূড়াটার মিল আছে।' রবিনের দিকে তাকালেন। 'সূর্যঘড়ির কাঁটা কেমন জিনিস? পিরামিডের মত। ওটার ছায়া পড়ে ডায়ালের ওপর, তা দেখেই আগে সময় অনুমান করত লোকে।'

'থ্যাংকস,' বলেই আবার লেখায় মন দিল রবিন।

লিখতে লিখতেই তার মনে হলো, তথ্যটা কিশোরকে জানালে কেমন হয়? হয়তো তেমন কিছুই না, কিন্তু কোন্ কথা থেকে যে কখন কী আবিষ্কার করে বসবে কিশোর পাশা, আগে থেকে বলা যায় না।

উঠে এসে ফোন করল রবিন।

ফোন ধরল কিশোর। রবিনের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ঢোক গিলল, শব্দটা এপাশ থেকেও শুনতে পেল রবিন। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'রবিন! পেয়েছি!'

'কী!'

'পেয়েছি! কাল সকালে লাইব্রেরিতে যাচ্ছ তো? দুপুরের আগেই ইয়ার্ডে চলে আসবে। ঠিক একটায়, দেরি কোরো না। সব কিছু তৈরি রাখব আমি।'

'কীসের তৈরি!' কিছুই বুঝতে পারছে না রবিন।

কিন্তু লাইন কেটে দিল কিশোর।

স্তব্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল রবিন, আস্তে করে নামিয়ে রাখল রিসিভার। নোট লেখা শেষ আর হলো না, কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠল সে।

রাতে ঘুম ভাল হলো না। সকালে লাইব্রেরিতে গিয়েও কাজে মন বসাতে পারল না রবিন। থেকে থেকেই আনমনা হয়েছে যাচ্ছে।

একটার আগেই ইয়ার্ডে পৌঁছে গেল রবিন। কিশোর, অগাস্ট, আর মুসা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পিকআপটাও তৈরি, ড্রাইভিং সিটে বোরিস, পাশে রোভার। দু'জনেই যাবে সঙ্গে। কিন্তু কোথায়? ট্রাকের পেছনে পুরু করে ক্যানভাস বিছানো, ছেলেদের বসার জন্যে। গোটা দুই বেলচাও আছে। কিশোরের কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা।

'কিন্তু যাচ্ছিটা কোথায়?' এই নিয়ে অন্তত দশবার প্রশ্ন করল রবিন। উত্তেজিত।

ছুটে চলেছে পিকআপ।

রাস্তার দিক থেকে মুখ ফেরাল মুসা। 'আমারও সেই প্রশ্ন! কিশোর, মাঝেমধ্যে তুমি এত বেশি বেশি করো না। আমাদেরকে ভাবনায় রেখে কী লাভ তোমার? আমরা তো তোমারই সহকারী, নাকি?'

'হোরাশিও অগাস্টের মেসেজের লেখা সত্যি কিনা, যাচাই করতে যাচ্ছি,' অবশেষে মুখ খুলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'বোরিস আর রোভারকে নিয়ে যাচ্ছি নিরাপত্তার জন্যে। ডাকাত ব্যাটারা যদি হামলা করে বসে, এই দুজনই যথেষ্ট। দশটা কালো-গুফোরও সাধ্য হবে না দু'ভাইয়ের মোকাবেলা করে।'

'আরে দূর, ওসব কথা শুনতে চেয়েছে কে?' গোঁ গোঁ করে উঠল মুসা। 'পারবে না, সে-তো আমরাও জানি। যা জানি না, সেটা বলো।'

'ঠিক আছে, বাবা, বলছি,' হাত তুলল কিশোর। 'সূত্রটা রবিনই দিয়েছে, কাল রাতে। ডায়াল ক্যানিয়নের আগের নাম ছিল সানডায়াল ক্যানিয়ন। এটা শুনেই বুঝে গেছি। ইস্, আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল! কাল ওরা আমাকে বেঁধে রেখেছিল, রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখেছি, লনে পাহাড়ের চূড়ার ছায়া! যেন একটা বিশাল সূর্যঘড়ি। গাস, বুঝেছ কিছু?'

'না,' সোজাসাপ্টা জবাব।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'বুঝেছি! সূর্যঘড়ি...তারমানে কাঁটার ছায়ার মাথা যেখানে পড়বে, সেখানেই রয়েছে রক্তচক্ষু! মাটির নীচে। তাই না?'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল।

'কিন্তু মস্ত বড় লন,' মুসা তত উৎসাহ পাচ্ছে না। 'একেক সময় কাঁটার ছায়া একেক জায়গায় পড়বে, কয় জায়গা খুঁড়ব? পুরো লন তো খোঁড়া সম্ভব না।'

'পুরো লন খুঁড়তে হবে কেন?' পকেট থেকে মেসেজটা বের করে ক্যানভাসের ওপর বিছাল কিশোর। 'আবার গোড়া থেকে আলোচনা করছি, অগাস্ট তোমার নাম, অগাস্ট তোমার খ্যাতি, অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য—এসব কথা গাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই লেখা হয়েছে। তারপর, পাহাড়প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করবে না, তোমার জন্ম তারিখের ছায়াতেই ওর অস্তিত্ব; এটাই হলো গিয়ে আসল কথা। বলতে চেয়েছেন, গাসের জন্মদিনে পাহাড়ের ছায়া যেখানে পড়বে, সেখানেই পাওয়া যাবে পাথরটা। ওর জন্ম কবে? অগাস্টের ছয় তারিখে। ক'টার সময়?'

'আড়াইটা?' বলল অগাস্ট।

'হ্যাঁ, আড়াইটার সময় যেখানে ছায়া পড়বে, খুঁড়তে হবে সেখানেই। গভীর করে খুঁড়তে হবে। মেসেজ এখানেই শেষ, বাকিটা লিখেছেন ভাবনা গুলিয়ে দেয়ার জন্যে। হ্যাঁ, আরেকটা বাক্যঃ সময় খুব মূল্যবান। তারমানে, বেলা আড়াইটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, দিনের অন্য কোন সময়ের ছায়া হলে চলবে না।'

'আর এক ঘণ্টাও তো নেই!' ঘড়ি দেখে বলে উঠল মুসা।

'দূরও আর বেশি নেই,' কিশোর বলল। 'এসে গেছি প্রায়।'

কী ভেবে পেছনে তাকাল মুসা। রাস্তা শূন্য। একটা গাড়িও দেখা যাচ্ছে না, অনুসরণ করছে না কেউ।

'আগেই দেখেছি, কেউ পিছু নেয়নি আমাদের। আর নিলে নিল। বোরিস আর রোভারের হাতের কিছু কিলঘুসি প্রাপ্যই হয়েছে ওদের।'

হঠাৎ মোড় নিয়ে পাশের সরুপথে নেমে এল পিকআপ। দু'পাশে পাহাড়। কত দিন আগে পথ বাঁধানো হয়েছিল, কে জানে, তারপর আর মেরামত করা হয়নি, নষ্ট হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, ছালচামড়া আর মাংস উঠে গেছে পথের, ছোট ছোট গর্তে পড়ে বিষম ঝাঁকুনি খাচ্ছে গাড়ি, ঝনঝন আর্তনাদ তুলছে পুরানো বডি।

'কিশোর, পেছনে নেই,' ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মুসা, 'কিন্তু সামনে আছে!'

দু'পাশে দু'জন করে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল, দৃষ্টি সামনে। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা কয়েক বিশাল ট্রাক, বুলডোজার, আর ইঞ্জিনে চলে এমন একটা দানবীয় বেলচা।

মিস্টার হোরাশিওর বাড়ির খানিকটা মস্ত চোয়ালে চেপে ধরে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে বেলচাটা, একটা ট্রাকে নামিয়ে দিয়ে চোয়াল ফাঁক করে আবার এগিয়ে যাচ্ছে আরেক লোকমা তুলে আনার জন্যে। বাড়ির ছাত আর একটা ধার ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছে যন্ত্রটা, বাকিটুকুও খতম করে দেবে দেখতে দেখতে। যেন একটা মহারাক্ষস।

বাড়ির পেছনের গাছপালা টিলাটক্কর যা আছে, সমান করে দিচ্ছে বুলডোজার। দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে হোরাশিওর অতি শখের বাগান।

'দানবের দল!' চিকচিক করছে অগাস্টের দু'চোখের কোণ। 'ইস, কী করছে! দাদা এখন থাকলে...,' গলা ধরে এল তার।

'সমান করে ফেলছে সব!' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'রক্তচক্ষু আর আগের জায়গায় আছে কিনা কে জানে!'

'মনে হয় আছে,' ভুরু কুঁচকে লনের দিকে তাকিয়ে আছে অগাস্ট। 'দেখছ, ওই যে পাহাড়ের ছায়া, ওদিকে কেউ নেই।'

রাবিশ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল একটা ট্রাক। মুখ বের করে ড্রাইভার হাঁকল, 'এই, সরো, পথ ছাড়ো। আমাদের তাড়া আছে।'

পিকআপকে রাস্তার একপাশে সরিয়ে রাখল বোরিস, পাশ কেটে চলে গেল ট্রাকটা। আরও ট্রাক এসে পড়েছে রাবিশের বোঝা নিয়ে। ওটাও চলে গেল।

খোলা জায়গায় নিয়ে যান, লনের দিকে দেখিয়ে বোরিসকে বলল কিশোর। 'কেউ কিছু বললে আমি জবাব দেব।'

'হোকে,' বলে আবার পিকআপ রাস্তায় তুলল বোরিস, শ'দুই গজ এগিয়ে লনের কাছে এসে থামল।

লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল ছেলেরা।

ওদেরকে দেখে ভাঙা বাড়ির দিক থেকে এগিয়ে এল একজন বেঁটে-খাটো লোক, মাথায় ধাতব হেলমেট, সুপারভাইজার বোধহয়।

'এখানে কী করছ?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'বাইরের লোক আসা নিষেধ।'

ভাবভঙ্গি দেখেই ভড়কে গেল মুসা আর রবিন। কী জবাব দেবে কিশোর?

কিন্তু জবাব তৈরিই রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধানের মুখে। 'আমার চাচা পুরানো জিনিসপত্র কিনেছিল এখান থেকে। কিছু ফেলে গেল কিনা দেখতে পাঠিয়েছে।'

'কিচ্ছু নেই!' সামান্যতম নরম হলো না লোকটা। 'একটা সুচও না। যাও।'

'আচ্ছা, কয়েক মিনিট দাঁড়াতে পারি আমরা?' সুর পাল্টাল কিশোর। 'এই যে আমার বন্ধু,' অগাস্টকে দেখাল সে, 'ইংল্যান্ড থেকে এসেছে। আমেরিকায় কী করে বাড়িঘর ভাঙা হয়, দেখেনি কখনও। ওর নাকি খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'শুনেছ, কী বলেছি তোমাকে?' ধমকে উঠল লোকটা। 'এখানে সারকাস চলছে না, দেখার কিছু নেই। গায়ে এসে যখন কিছু পড়বে, তখন বুঝবে ঠেলা। ব্যথা পাবে, ঝামেলা বাধাবে খামোকা।'

'এই...,' চট করে ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর, 'সওয়া দুটো বাজে, এই পনেরো মিনিট?' অনুরোধ করল সে। 'পনেরো মিনিট পরেই চলে যাব।'

'পনেরো সেকেন্ডও না!' ভীষণ একরোখা লোক। 'যাও, ভাগো!'

লনে এসে পড়া ছায়ার দিকে তাকাল ছেলেরা। পনেরো মিনিট পরেই পাহাড়ের চূড়ার ছায়া পড়বে রক্তচক্ষু যেখানে আছে, সেখানে।

'ঠিক আছে, স্যার, যাচ্ছি,' কিশোরও নাছোড়বান্দা। 'কিন্তু স্যার, দু'একটা ছবি তুলতে তো কোন আপত্তি নেই?'

জবাবের অপেক্ষা করল না কিশোর। কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা নামিয়ে নিয়ে পা বাড়াল ছায়ার দিকে। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেই থেমে গেল সুপারভাইজার, বোধহয় ভাবল ওদিকে গেলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই।

ছায়ার মাথা থেকে গজখানেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর, ফিরে ভাঙা বাড়িটার ছবি তুলল একটা। ক্যামেরা আবার কাঁধে ঝুলিয়ে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধল সময় নিয়ে। ফিরে এল।

'থ্যাংক ইউ, স্যার,' বলল কিশোর। 'যাচ্ছি।'

'আর যেন না দেখি এখানে!' বেশি খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছে ভাবল হয়তো লোকটা, তাই বলল, 'তবে, মাস তিনেক পরে এলে আর কিছু বলব না। ছটা বাড়ি আর বড় সুইমিং পুল বানিয়ে ফেলব ততদিনে, চাইলে একটা বাড়ি কিনতেও পারো।' ছোট্ট একটা হাসি দিল সে।

পিকআপে এসে উঠল কিশোর। তার পিছনে এল বিষণ্ণ তিন কিশোর।

স্টার্ট নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করতেই ক্ষোভ ঝাড়ল মুসা, 'একেবারে ছোটলোক, ব্যাটা! পনেরোটা মিনিটও থাকতে দিল না। লাঠি দিয়ে কুত্তা খেদাল যেন! গেল গাসের রক্তচক্ষু! কাল এসে লনের চিহ্নও দেখব না!'

'কাল আসতে যাচ্ছে কে?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'আজ রাতেই আসব।'

'অন্ধকারে?' হাঁ হয়ে গেছে রবিন। 'অন্ধকারে কী দেখব? ছায়া-টায়া কিচ্ছু থাকবে না তখন!'

'ঈগল পাখিকে বলব জায়গাটা খুঁজে দিতে,' মুচকি হাসল কিশোর। ব্যস, এই পর্যন্তই, আর একটাও কথা বের করা গেল না তার মুখ থেকে।

ষোলো

ক্লান্ত শামুকের মত যেন গড়িয়ে চলল সময়। এক বিকেল পার করতেই ছেলেদের মনে হলো কয়েক শ' যুগ পার হচ্ছে। সময় কাটানোর জন্যে কত কী-ই যে করল ওরা: বোরিস আর রোভারকে কাজে সাহায্য করল, মেরিচাচী দশবার বলেও যে কাজে হাত দেয়াতে পারেনি ছেলেদেরকে, আর কিছু না পেয়ে শেষে তেমন কাজও করল ওরা। চাইকী, অনেক পুরানো কয়েকটা লোহার চেয়ারের মরচে তুলল মুসা সিরিশ দিয়ে ঘষে, তারপর ব্রাশ নিয়ে রঙ করায় মন দিল। কিশোর এসবের মধ্যে নেই।

ডায়াল ক্যানিয়ন থেকে ফিরেই কিশোর সেই যে তার ওয়ার্কশপে ঢুকেছে, আর বেরোনোর নাম নেই। অন্য তিনজনের একজনকেও ঢুকতে দিল না। রক্তচক্ষু খোঁজার জন্যে কোন যন্ত্র বানাচ্ছে নাকি?'

অবশেষে শেষ হলো দীর্ঘ বিকেল। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে ফেলল ছেলেরা, বোরিসকেও খেয়ে নিতে বলল কিশোর।

খেয়েদেয়ে পিকআপ বের করল বোরিস, ইয়ার্ড থেকে কয়েক ব্লক দূরে সহজে চোখে পড়ে না এমন একটা জায়গায় এনে গাড়ি থামিয়ে তাতে বসে রইল চুপচাপ।

'ব্যাটাদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে কিছু করতে হবে এবার,' কিশোর বলল। 'হ্যানসনকে আসতে ফোন করে দিয়েছি, অন্ধকার নামলেই চলে আসবে। আমাদের তৈরি থাকা দরকার।'

'এই শেষবার রোলস-রয়েসে চড়া!' আফসোস করল মুসা, 'তারপর থেকে পা সম্বল!'

'কেন, সাইকেল আছে না আমাদের?' রবিন মনে করিয়ে দিল।

'ওই তো, পা-ই তো সম্বল,' মুসা বলল। 'ইঞ্জিন তো আর নেই, আরামও নেই। হাঁটার চেয়ে কম কষ্ট নাকি সাইকেল চালানো? পাহাড়ী পথে ওঠার সময় না বোঝা যায় ঠেলা! তিন গোয়েন্দার জারিজুরি শেষ।'

'এতদিন যে গাড়ি ছিল না, আমরা বসে থেকেছি নাকি?' কিশোর বলল। 'কোন না কোনভাবে কাজ উদ্ধার হয়েই গেছে।'

রোলস রয়েসের ব্যাপারে আগ্রহী মনে হলো অগাস্টকে, কী করে পাওয়া গেল ওটা, জানতে চাইল।

সংক্ষেপে জানাল মুসা। আক্ষেপ করল, 'এই শেষবার, বুঝলে? আর পাব না। মানা করে দিয়েছে রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানির ম্যানেজার। আরেকবার চাইতে গেলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।'

'আরে দূর, কী বকবক শুরু করেছ!' ধমক লাগাল কিশোর। 'যখন ঠেকায় পড়ব তখন দেখা যাবে। চলো, তৈরি হয়ে নিই।'

নিজের বেডরুমে তিনজনকে নিয়ে চলল গোয়েন্দাপ্রধান।

যেতে যেতে মুসাকে বলল অগাস্ট, 'একটা কথা কিন্তু ঠিক। ক্যালিফোর্নিয়া অনেক বড়, গাড়ি ছাড়া অসুবিধেই হবে তোমাদের।'

'ইয়ার্ডের পিকআপ আছে,' বলল রবিন। 'ওটা ব্যবহার করতে পারছি।'

'পারছ, কিন্তু দেখছি তো যতবারই দরকার পড়ছে, গিয়ে চাইতে হচ্ছে মেরিচাচীর কাছে। তখন বোরিসের হাতে কাজ আছে কিনা, সেটাও দেখতে হচ্ছে। অনেক ফাঁকড়া না?'

আলমারি খুলে চারটে জ্যাকেট বের করল কিশোর। সব ক'টাই তার, বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন রঙের। একেক জনকে একেকটা দিয়ে পরতে বলল। অগাস্টের গায়ে মোটামুটি ঠিকই লাগল, রবিনের গায়ে সামান্য ঢলঢলে হলো কিন্তু মুসার গায়ে লাগতেই চাইল না; জোরজার করে পরতে হলো, অন্যেরা সাহায্য না করলে পিঠের ওপর থেকেই নামাতে পারত না; চেন লাগাতে পারল না, সামনের দিক খোলা রইল জ্যাকেটের।

বেরিয়ে এল ওরা।

মেরিচাচী ওদেরকে দেখেই চোখ কপালে তুললেন। 'আরে, কী কাণ্ড! এই কিশোর, এতই শীত লাগছে তোদের? একজনের জ্যাকেট আরেকজনে না পরলে চলছে না। কী জানি বাপু, আজকালকার ছেলেছোকরাদের মতিগতি বুঝি না।'

চাচাও হাঁটাহাঁটি করছেন বাইরে। ফিরে তাকালেন।

'কয়েকটা লোককে ফাঁকি দিতে হবে, চাচী,' কিশোর বলল। সত্যি কথাটাই বলল কিশোর।

'বাচ্চাদের খেলা!' দাঁতে পাইপ, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফকফক করে ধোঁয়া ছাড়ছেন রাশেদ পাশা। 'ছেলেবেলায় আমরাও ওরকম খেলেছি, কত। আহা, কী ছিল সেসব দিন! মামা-বাড়িতে যেতাম, শীতের সন্ধ্যায় কিষাণ বাড়িতে খড় পোড়াত, ধোঁয়া উঠত, গন্ধ এখনও যেন নাকে লেগে রয়েছে! চাঁদনী রাতে খেজুরের রস চুরি করতে যেতাম মামাতো ভাইদের সঙ্গে...যদি চিনে ফেলে কেউ? তাই মামার শার্ট-পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে ছদ্মবেশ নিতাম...ঢলঢল করত...আহ্, বাচ্চা থাকাই ভাল। সোনালি দিনগুলো উড়ে চলে যায়...যেতে দাও, মেরি, ওদের আনন্দ মাটি কোরো না।'

কিশোরের ওয়ার্কশপে চলে এল ছেলেরা। ছোট টেবিলে একটা জিনিস পড়ে আছে। একটা যন্ত্র, ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের মত দেখতে, সরু দুটো তার বেরিয়ে এসেছে মূল অংশ থেকে, তারের মাথায় হেডফোন লাগানো। বোঝা গেল, সারা বিকেল এটা নিয়েই খেটেছে কিশোর।

এক কোণে চারটে বড় পুতুল, ওই যে, দরজিদের পোশাক তৈরি করার ডামি, যেগুলো কিনে এনেছিলেন রাশেদচাচা, মুণ্ডুশূন্য চারটে ধড়। নীচের স্ট্যান্ড কেটে ফেলে দিয়েছে কিশোর।

'এসো, হাত লাগাও,' ডাকল সে। 'এগুলোকে পোশাক পরাতে হবে। কেন জ্যাকেটগুলো পরে এসেছি, বুঝেছ তো? দূরবীন নিয়ে কেউ ইয়ার্ডের ওপর চোখ রেখেছে কিনা জানি না। রাখতেও পারে। হাতে করে আলাদা কাপড় আনলে ওরা সন্দেহ করে বসত। জ্যাকেট খোলো, পুতুলগুলোকে পরাও।'

জ্যাকেট পরে হাস্যকর রূপ নিল দরজির ডামি। হাত নেই, দু'পাশে ঝুলছে

জ্যাকেটের হাতা।

'ভূত মনে হচ্ছে,' মুসা মন্তব্য করল। 'এই জিনিস দেখিয়ে ফাঁকি দিতে চাও।'

'মাথা লাগালেই অনেক জ্যান্ত মনে হবে,' কিশোর আশ্বাস দিল।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে চারটে বেলুন বের করল সে। ফুঁ দিয়ে ফোলাল। তারপর সুতো দিয়ে বাঁধল কাটা গলার সঙ্গে। এদিক দুলছে ওদিকে দুলছে বেলুন, মনে হচ্ছে যেন মাথা নাড়ছে পুতুল।

হা হা করে হেসে উঠল মুসা। রবিন আর অগাস্টও হাসল।

'অন্ধকারে জ্যান্তই মনে হবে,' এপাশ থেকে, ওপাশ থেকে দেখে আবার বলল কিশোর।

অপেক্ষা করছে ওরা। ধীরে ধীরে নামল অন্ধকার। পুতুলগুলোকে এখন আর হাস্যকর লাগছে না, হঠাৎ কেউ দেখলে বরং ভয়ই পেয়ে যাবে।

ইয়ার্ডের চত্বরে গাড়ির বাঁশি শোনা গেল।

'হ্যানসন,' কিশোর বলল।

খানিক পরেই ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ এসে থামল ওয়ার্কশপের বেড়ার বাইরে।

'ফোনেই বলেছি, ওকে এখানে গাড়ি নিয়ে আসতে,' জানাল কিশোর। 'এসো, একটা করে পুতুল তুলে নাও সবাই। চট করে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে ফেলো।'

অন্ধকারে গা ঢেকে রয়েছে কালো রোলস রয়েস, কিন্তু তারার আলোর জন্যে পুরোপুরি লুকাতে পারছে না চকচকে শরীর।

'মাস্টার কিশোর?' ফিসফিস করে বলল হ্যানসন, গাড়ি থেকে নেমে পড়ছে। 'দরজা খুলে দিয়েছি।' পেছনের সীটে পুতুলগুলোকে তুলে দেয়া হলো, এমনভাবে, দেখলে মনে হবে চার কিশোর বসে আছে।

'হ্যানসন,' কিশোর নির্দেশ দিল, 'কোস্ট রোড ধরে দ্রুত চলে যাবেন। মোড় নিয়ে পাহাড়ের পথ ধরে এগিয়ে যাবেন একটানা দু'ঘণ্টা, তারপর আরেক দিক দিয়ে ঘুরে এসে এখানে ফেলে যাবেন ডামিগুলো। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'যান। গুডবাই। আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না আমাদের। অনেক খারাপ-ব্যবহার করেছি হয়তো, কিছু মনে রাখবেন না।'

'আরে না না, কী যে বলেন,' হাঁ হাঁ করে উঠল ইংরেজ শোফার, 'খারাপই লাগছে আমার। আপনাদের সঙ্গে কাজ করে অনেক মজা পেয়েছি। যাই, সুযোগ পেলেই দেখা করব।'

'যান। ও হ্যাঁ, হেডলাইট জ্বালবেন না।'

'পুলিশ থাকলে?' অগাস্ট প্রশ্ন করল।

'ও পথে রাতে পুলিশ থাকে না, বিশেষ কোন ব্যাপার না ঘটলে।'

চলে গেল রোলস রয়েস, প্রায় নিঃশব্দে, চুপিচুপি গা ঢাকা দিয়ে পালাল যেন।

'বাহ্, চমৎকার!' এতক্ষণে কথা বলল রবিন। 'কেউ চোখ রেখে থাকলে মনে করবে, আমরাই যাচ্ছি।'

'ভেবে চুপ করে বসে থাকবে না,' কিশোর বলল। 'রোলস রয়েসের পিছু নেবে। চলো, এবার আমরাও যাই। লাল কুকুর চার দিয়ে বেরোতে হবে, বোরিস ওদিকেই পিকআপ নিয়ে বসে আছে।'

ওয়ার্কশপে ঢুকে যন্ত্রটা নিয়ে এল কিশোর। লাল কুকুর চার দিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকার নির্জন পথে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পিকআপ, প্রায় দেখাই যায় না, আগে থেকে না জানলে গাড়িটার গায়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ত ওরা।

ছেলেরা চড়ে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস। পেছনে তাকিয়ে দেখল একবার কিশোর, না, কেউ অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে না।

নিরাপদেই পৌঁছল পিকআপ ডায়াল ক্যানিয়নে। হোরাশিও অগাস্টের ভাঙা বাড়ির কাছে এনে গাড়ি রাখল বোরিস। নীরব, নির্জন, কোথাও কোনরকম নড়াচড়ার আভাস নেই। লনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বড় ট্রাক আর বুলডোজার, যেন ভূত! প্রহরী নেই, রাখার কথা মনেই হয়নি বোধহয় কড়া সুপারভাইজারের।

'বোরিস,' চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল কিশোর, 'ট্রাক ঘুরিয়ে রাস্তায় নিয়ে রাখুন। কড়া নজরে রাখবেন। কিছু দেখলেই দু'বার হর্ন টিপবেন।'

'ঠিক আছে,' বলল বোরিস।

যন্ত্রটা নামিয়ে নিল মুসা, তার হাত থেকে নিয়ে কাঁধে ফেলল কিশোর। 'এইবার দেখা যাক আমার ডিটেকটর ঈগলের সন্ধান পায় কিনা।'

'কী বলছ, সহজ করেই বলো না, বাবা!' দু'হাত তুলল মুসা।

হাতে বেলচা নিয়ে পিকআপ থেকে লাফিয়ে নামল রবিন আর অগাস্ট।

'এটা মেটাল ডিটেকটর,' যন্ত্রটার লম্বা হাতলে চাপড় দিল কিশোর। 'ধাতব জিনিস মাটির কয়েক ফুট নীচে থাকলেও ঠিক ধরে ফেলবে,' লনের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

'কিন্তু রক্তচক্ষু ধাতু নয়,' রবিন প্রতিবাদ করল, 'পাথর।'

'সেটা আমিও জানি,' চলতে চলতেই বলল কিশোর। 'দুপুরে জুতোর ফিতে বেঁধেছিলাম, মনে আছে? সেই সুযোগে রূপার একটা আধডলার গুঁজে দিয়েছিলাম মাটিতে। মুদ্রাটার এক পিঠে ঈগলের ছবি আছে না? ওই পাখিকেই এখন জিজ্ঞেস করব, পাথর আছে কোথায়?'

'কিন্তু, দুটো পনেরো মিনিটে মুদ্রা গুঁজেছ,' সামনের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে বলল অগাস্ট। 'চিহ্ন কি ঠিক হবে?'

'সে-জন্যেই একটু এগিয়ে গুঁজেছি, আড়াইটায় কোথায় ছায়া পড়বে অনুমান করে নিয়ে। এই যে, এখানেই কোথাও হবে,' কাঁধ থেকে যন্ত্র নামাল সে।

ডিটেকটরের চ্যাপ্টা গোল দিকটা মাটিতে রেখে হেডফোন পরে নিল কিশোর। তারপর হাতলের কাছের একটা সুইচ টিপে দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে-পেছনে আশপাশে সরাতে থাকল যন্ত্রটা। 'ধাতুর সন্ধান পেলেই গুঞ্জন উঠবে হেডফোনে,' বলল সে।

কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও হলো না। ভারি যন্ত্র নাড়াচাড়া করে ক্লান্ত হয়ে গেল কিশোর। মুসার হাতে তুলে দিল।

মুসাও চেষ্টা করল বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু গুঞ্জন তুলতে যেন নারাজ হয়ে আছে হেডফোন। 'ঈগল পাখি উড়ে চলে গেছে!' বলল সে একসময়। হতাশ। 'সারারাত খুঁজলেও পাব না!'

'কিন্তু এখানেই কোথাও থাকার কথা!' ফিরে বাড়ির অন্ধকার ছায়াটার দিকে তাকাল কিশোর, অনুমান করে নিল আবার। এখানেই আছে। আরেকটা চক্কর দাও।'

চক্কর পুরো করার দরকার হলো না, মৌমাছির গুঞ্জন উঠল হেডফোনে। লাফিয়ে উঠল মুসা, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

'চুপ! আস্তে!' মুসার কান থেকে হেডফোন খুলে নিয়ে পরল কিশোর। হ্যাঁ, ঠিকই। 'আর সামান্য একটু পিছাও তো...আরেকটু পাশে...হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে, হয়েছে, থামো!'

হেডফোন খুলে কোমরের বেল্টে ঝোলানো টর্চ খুলল কিশোর। হাঁটু গেড়ে বসে আলো ফেলল মাটিতে, আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে তুলে নিল মুদ্রাটা। 'রবিন, গাস, খোঁড়ো এখানেই।'

বেশ কিছুক্ষণ বেলচা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রবিন আর অগাস্ট। মুসা আর কিশোরের হাতে তুলে দিল বেলচা। পালা করে মাটি খুঁড়ে চলল চার কিশোর। কিন্তু রক্তচক্ষুর দেখা নেই।

নীরব নিথর চারদিক, বেলচার থ্যাপ থ্যাপ ছাড়া কোন শব্দ নেই, এমনকী একটা ঝিঁঝিও ডাকছে না।

এক সময়ে থেমে গেল মুসা। বেলচায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'উফ্ফ্, আর পারছি না!' হাঁপাচ্ছে পরিশ্রমে। 'কিশোর, ভুল করেছ, জায়গা এটা না।'

চুপ করে ভাবছে কিশোর। বাড়ির দিকে তাকাল আরেকবার, তারপর ফিরল কালো পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। দূরত্ব আন্দাজ করল তারার আলোয়। বাড়িটার দিকে এক কদম এগোল। 'এখানে এসো। দেখা যাক খুঁড়ে।'

নীরবে বেলচা চলল আবার কিছুক্ষণ। হঠাৎ ঠং করে কীসে যেন বাড়ি খেল বেলচা, পাথুরে কিছুতে।

'কিশোর!' কোথায় কী করছে ভুলে গিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'চুপ!' দ্রুত একবার এদিক ওদিক চেয়ে নিল কিশোর। নেমে পড়ল দ্বিতীয় গর্তটায়। টর্চের আলোয় দেখা গেল ছোট একটা বাক্সের কোণ বেরিয়ে আছে। ঝুঁকে আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে মাটি সরাল, শক্ত করে চেপে ধরে টান দিতেই উঠে এল বাক্সটা। 'এটাই হবে,' ফিসফিস করল সে। 'সাজিমাটি দিয়ে তৈরি।' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। 'রবিন, টর্চটা ধরো।'

ছোট্ট একটা সোনার তালা লাগানো বাক্সে। মুঠো করে ধরে চাপ দিল কিশোর, খুলল না তালা। ছোট হলেও বেশ শক্ত। শেষে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে জোরে জোরে কয়েক ঘা লাগাতেই কটাং করে ভেঙে গেল আংটা। তালাটা খুলে ছিটকে পড়ল।

আস্তে করে ডালা তুলল কিশোর।

টর্চের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল একটা লাল পাথর, তুলোর শয্যায় শুয়ে আছে।

'ইয়াল্লা!' আবার চেঁচাল মুসা। 'কিশোর, দিয়েছ সেরে কাজ!'

'বাহ, ভারি সুন্দর!' অগাস্টও চেঁচিয়ে উঠল।

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল অন্য তিনজন।

ঝাড়া মেরে অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে যেন তীব্র উজ্জ্বল আলো। শক্তিশালী কয়েকটা টর্চের আলো পড়েছে গায়ে। চোখ মেলতে পারছে না ছেলেরা। পায়ের শব্দ কানে আসছে।

'নড়বে না।' গর্জে উঠল একটা পরিচিত ভারি কণ্ঠ। 'দাও, পাথরটা।'

চোখ পিটপিট করছে ছেলেরা, আবছা মত দেখতে পাচ্ছে চারটে টর্চের ওপাশে চার জোড়া গোঁফ, এগিয়ে আসছে চারজন মানুষ। এক জনের হাতে পিস্তল। ভয়ংকর নলের কালো মুখ ছেলেদের দিকে।

'কালো-গুঁফোর দল!' চাপা কণ্ঠে বলল রবিন। 'ব্যাটারা ঘাপটি মেরে বসেছিল, ট্রাকগুলোর আড়ালে।'

'দুপুরে এসেছিলে, শুনেছি,' বলল রাইস। 'ভাগিয়ে নাকি দিয়েছিল। শুনেই বুঝেছি, আবার আসবে তোমরা।'

'আলাপ বাদ দাও তো,' জ্যাকির খসখসে গলা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে। 'পাথরটা নিয়ে সরে পড়া দরকার। এই ছেলে, দাও ওটা।' এগিয়ে এল সে।

ভীষণ ভয় পেয়েছে কিশোর, এতখানি ভয় পেতে আর তাকে দেখেনি কখনও রবিন আর মুসা। চোখ উল্টে পড়ে যাবে যেন যে কোন সময়! কাঁপছে থরথর করে। তার কাঁপা হাত থেকে বাক্সটা উল্টে পড়ে গেল গর্তে! 'এই...গুলি কোরো না! ...আ-আমি তুলছি!'

ঝুঁকে বসে কাঁপা কাঁপা আঙুলে ঝুরঝুরে মাটি ঘাঁটল সে, পাথরটা দেখা গেল হাতে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই যে, নাও! তবু আমাদেরকে মেরো না!'

কিন্তু কেউ এসে পাথর নেয়ার সময় পেল না। আচমকা হাত ঘুরিয়ে পাথরটা ছুঁড়ে মারল সে, উজ্জ্বল আলোয় চকিতের জন্যে একটা রঙিন ধনুক সৃষ্টি করে জ্যাকির মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল পাথরটা, হারিয়ে গেল পিছনের অন্ধকারে।

সতেরো

গাল দিয়ে উঠল জ্যাকি, এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়াল। 'খোঁজো!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আলো ঘোরাও, জলদি!'

ছেলেদের দিক থেকে এক সঙ্গে ঘুরে গেল সব ক'টা টর্চ।

'দৌড় দাও!' চেঁচিয়ে নিজের সঙ্গীদেরকে বলল কিশোর। 'জলদি! ওরা গুলি করবে না।'

চারটে তাড়া খাওয়া খরগোশের মত ছুটল ছেলেরা রাস্তার দিকে, অন্ধকার লন

উড়ে পেরিয়ে এল যেন। জায়গামতই বসে আছে বোরিস, ছেলেদেরকে ছুটে আসতে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল। স্টার্ট দিল ইঞ্জিন।

'বোরিস! জলদি!' পিকআপে উঠেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'জলদি ছাড়ুন!'

কোন প্রশ্ন করল না বোরিস।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়েই ছুটতে শুরু করল পিকআপ। পেছনে তাকিয়ে দেখল ছেলেরা, গুফোর দলকে দেখা যাচ্ছে না। পাথরটা এখনও পায়নি নিশ্চয়, ওটা খোজা নিয়েই ব্যস্ত।

থরথর করে কাঁপছে পিকআপের পুরানো বডি, নীরব রাতে ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শুনে মনে হচ্ছে যেন কোন দৈত্যের গর্জন, দু'পাশের পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে অনেক বেশি বিকট হয়ে উঠছে শব্দ। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, স্থির হয়ে বসে থাকাই মুশকিল। একে অন্যের গায়ে গা ঠেকিয়ে চাপাচাপি করে বসে আছে ছেলেরা।

সরু গিরিপথ পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠল পিকআপ, এইবার শান্তি।

তবুও চুপ করে রইল ছেলেরা। ইয়ার্ডে পৌছার আগে একটা কথাও বলল না কেউ।

ইয়ার্ডের অন্ধকার চত্বরে এনে গাড়ি রাখল বোরিস।

চুপচাপ ট্রাক থেকে নামল ছেলেরা। বেলচা, মেটাল ডিটেকটর ফেলে এসেছে, আনতে পারেনি। আর অবশ্যই, লাল পাথরটাও।

'অফিসের ধারে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল চার কিশোর।

'সব শেষ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা।

'তীরে এসে তরী ডুবল!' রবিনও বিষণ্ণ।

'তাই মনে হচ্ছে?' সামান্যতম মন খারাপ হয়নি কিশোরের।

'মনে হচ্ছে মানে?' অগাস্টের কণ্ঠে বিস্ময়।

'ভেবেছিলাম,' কিশোর বলল, 'রোলস রয়েসের দিকে নজর দেবে ওরা। ফাঁকি দিতে পারব। উল্টে আমাদেরকেই ফাঁকি দিয়ে দিল। ভাগ্যিস বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল।'

'হ্যাঁ, বেঁচে ফিরেছি বটে, কিন্তু পাথরটা গেল!' মুসার গলায় তীব্র ক্ষোভ।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'টর্চটা জ্বালো তো।'

টর্চ জ্বাসল রবিন, কিশোরের হাতে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল।

গোয়েন্দাপ্রধানের ছড়ানো হাতের তালুতে জ্বলছে উজ্জ্বল লাল চুনি!

'আসল রক্তচক্ষু,' হাসল কিশোর। 'ছুঁড়ে ফেলেছি নকলটা, তিন ফোঁটা যেটা ফেলে গিয়েছিল, মনে আছে? কেন জানি মনে হলো তখন, নিয়ে নিলাম সঙ্গে। এখন তো দেখছ, কাজেই লেগেছে। গর্তে আসলটাই ফেলেছিলাম। এক ফাঁকে ওটা তুলে পকেটে ঢুকিয়ে নকলটা বের করেছি। হাহ্ হাহ্! কলা দেখিয়ে এসেছি ব্যাটাদের!'

'কিশোর, সত্যিই তুমি একটা জিনিয়াস!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল রবিন।

'আর অভিনয়টা কী করল দেখলে!' অগাস্ট বলল। 'আমি তো ভেবেছিলাম, হার্টফেল করছে! ডাকাতগুলোকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে দিল!'

'নাহ, আমিও মেনে নিচ্ছি,' হাত তুলল মুসা, ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'আমাদের কিশোর পাশার কাছে শার্লক হোমস কিংবা এরকুল পোয়ারো কিছু না!'

'আমিও তাই বলি,' অন্ধকার থেকে ভেসে এল শীতল, শান্ত একটা কণ্ঠ। 'কিন্তু আর কোন চালাকি নয়, খোকা।'

ছেলেদের হতভম্ব ভাব কাটার আগেই দপ করে জ্বলে উঠল অফিসের বাইরে লাগানো আলো। লম্বা, পাতলা লোকটা নেমে এল দরজার কাছ থেকে। ডান হাত বাড়ানো, পাথরটা নেয়ার জন্যে। অন্য হাতে মারাত্মক ছড়িটা। তিন-ফোঁটা!

বোকা হয়ে গেছে ছেলেরা। কথা ফুটল না মুখে।

'পালানোর চেষ্টা কোরো না,' কড়া গলায় বলল তিন-ফোঁটা। হাতের ছড়িটা ঠেলে দিল ছেলেদের দিকে, ঝট করে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলা। ঝকঝক করছে।

'সেই কখন থেকে বসে আছি,' বলল সে। 'চমৎকার বুদ্ধি করেছিলে, রোলস রয়েসে করে ডামি পাঠানো! কিন্তু কাজ হলো না কিছুই। তোমাদের চালাকি ওরাও ধরে ফেলেছে, আমিও। কেন যেন মনে হচ্ছিল, গোঁফওয়ালা রামছাগলগুলোকে ধোঁকা দেবেই তোমরা। তাই এখানে বসে আছি। ঠিকই করেছি। দাও।'

আর কিছু করার নেই, ভাবল রবিন, রক্তচক্ষু হাত ছাড়া করতেই হচ্ছে।

এখনও দ্বিধা করছে কিশোর। হাতের তালুতে যেন ওজন পরীক্ষা করল পাথরটা, ঢোক গিলল। মুখ তুলে তাকাল লোকটার দিকে। 'মিস্টার রামানাথ, আপনি কি কাটিরঙ্গা মন্দিরের কেউ? ন্যায় বিচারের মন্দিরের?'

'নিশ্চয়ই,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রামানাথ। 'নইলে পৃথিবীর এ মাথায় আসি? আমি মন্দিরের পুরোহিত। পঞ্চাশ বছর হলো, মন্দির থেকে চুরি গেছে রক্তচক্ষু, মন্দিরের একজন টাকা খেয়ে হোরাশিও অগাস্টকে দিয়ে দিয়েছিল ওটা। তখন থেকেই খোঁজা হচ্ছে ওই পুণ্য-পাথর,' চুনিটার উদ্দেশে মাথা নোয়াল সে। 'আমার অনেক ভাগ্য, অনেক পুণ্যের ফলেই আজ খুঁজে পেয়েছি এটা। ভগবান দয়া করেছেন।' এক কদম বাড়াল। 'দাও।'

কিশোরের পেট ছুঁই ছুঁই করছে ছুরির ফলা, কিন্তু সে অবিচল। বলল, 'পাথরটার ক্ষতি করার ক্ষমতা দূর হয়েছে পঞ্চাশ বছরে, ঠিক, কিন্তু পুরোপুরি কি হয়েছে? আপনি চুরি করে কিংবা ছিনিয়ে নিলে ক্ষতি হবে না?'

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রামানাথের শরীরে। এক লাফে পিছিয়ে গেল সে। সট করে ছুরির ফলা ঢুকে গেল ছড়ির খাপে।

'গাস, এই নাও,' পাথরটা বাড়িয়ে ধরল কিশোর। 'আমি এটা খুঁজে পেয়েছি, তোমাকে উপহার দিলাম। তোমার কিছু হবে না। কিন্তু যদি কেউ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়, পাথরের ভয়ানক অভিশাপ নামবে তার ওপর।'

থরথর করে কেঁপে উঠল রামানাথ। দু'চোখে আতংক। সামলে নিতে সময় লাগল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আ-আমাকে ক্ষমা করো, খোকা! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম!' ছড়ি ফেলে দিয়ে দু'হাত জড়ো করে প্রণাম করল রক্তচক্ষুকে। 'ঘাট

হয়েছে, ভগবান, অধমকে ক্ষমা করো!'

মুখ তুলে কিশোরের দিকে তাকাল রামানাথ। 'কিশোর, চলো না অফিসে বসি? কথা আছে।'

'চলুন।'

অফিসে এসে ঢুকল পাঁচজনেই। চেয়ার টেনে বসল। পকেট থেকে চেকবই আর কলম বের করে খসখস করে লিখল রামানাথ। ছিঁড়ে নিয়ে চেকটা ঠেলে দিল অগাস্টের দিকে। 'দেখো, এতে চলবে কিনা। রক্তচক্ষু তোমাদের কাছে একটা দামী পাথর, আর কিছু না, কিন্তু আমার কাছে দেবতা। যদি ওতে না হয়, আরও টাকা দেব। কিন্তু দেবতাকে না নিয়ে দেশে ফিরব না।'

চেকের অঙ্ক দেখে চোখ কপালে উঠল চার কিশোরের।

উঠে এসে আস্তে করে পাথরটা টেবিলে রাখল অগাস্ট, চেকটাও, রামানাথের সামনে। 'আপনার দেবতাকে আটকাব না আমি, মিস্টার রামানাথ, নিয়ে যান। টাকাও লাগবে না। যান, রক্তচক্ষু উপহার দিলাম আমি আপনাকে।'

আরেকবার পাথরটাকে প্রণাম করে সযত্নে বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রামানাথ। দু'গালে অশ্রুধারা। চেকটা আবার ঠেলে দিয়ে বলল, 'তোমার মত নির্লোভ ছেলে আমি দেখিনি, গাস, মাই বয়! আমাকে অপমান কোরো না, এই টাকাটা তোমাদেরকে আমি উপহার দিলাম। ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন। যা দিলাম, এটা আমার কাছে কিছুই না। নাও। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমরা অনেক বড় হবে, অনেক অনেক বড়।'

চেকটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল অগাস্ট।

'আচ্ছা, মিস্টার রামানাথ,' কিশোর বলল, 'কয়েকটা কথার জবাব দেবেন?'

'বলো?'

'কী করে জানালেন, রক্তচক্ষু আমেরিকায় আছে?'

'আমরা জানতাম, হোরাশিও অগাস্টই রক্তচক্ষু নিয়ে পালিয়েছে। পালাল তো পালাল, একেবারে গায়েব। কত খোঁজাখুঁজি করেছি, পাইনি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর তার নাম ছাপা হলো পত্রিকায়, তার সম্পর্কে লেখা হলো। ছুটে এল আমেরিকায়।'

'তো, কালো-গুঁফোদের ব্যাপারটা কী? ওরা কী করে জানল রক্তচক্ষুর কথা?'

'আমি বলেছি। অনেক টাকা দেব চুক্তি করে আমিই ওদের কাজে লাগিয়েছি।'

'অ। আর উকিল রয় হ্যামার? তার কী লাভ ছিল?'

'চিঠির কপিটা কিনেছি তার কাছ থেকে, ব্যস, এই-ই।'

'হ্যারিসন?'

'ওকে স্রেফ ভয় দেখিয়ে খবর জোগাড় করতে চেয়েছিল রাইস, আর কিছু না। আমি কিছু টাকা দিয়ে দেব ভাবছি ওকে।'

'আচ্ছা, মিস্টার রামানাথ,' জিজ্ঞেস করার জন্যে অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছে মুসা, 'সেদিন বললেন জিকোকে মেরে ফেলেছেন, ও আবার জ্যান্ত হলো কী করে?'

হাসল রামানাথ। 'মারিনি। তোমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে ছুরিতে রঙ

মাখিয়ে এনেছিলাম।'

'উফফ্, সত্যি যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন না!' রবিনও হাসল।

'একটা কথা,' হাত তুলল কিশোর। 'ওরা তো আর টাকা পেল না, রাইসের দলের কথা বলছি। যদি এখন পাথরটা ছিনিয়ে নিতে চায় আপনার কাছ থেকে?'

শীতল হাসি ফুটল রামানাথের ঠোঁটে, বুকের ভেতর কাঁপন তোলে সে ভয়ানক হাসি। 'খোকা, ভুলে যাচ্ছ কেন আমি ন্যায় বিচারের মন্দিরের পুরোহিত? পাহাড়ী যোদ্ধার রক্ত বইছে আমার শরীরে। বড়াই করছি না, জানো, মানুষখেকো বাঘ পথ ছেড়ে দেয় আমাদের দেখলে? আমার কাছ থেকে রক্তচক্ষু ছিনিয়ে নেবে কয়েকটা ছিঁচকে চোর, এতই সহজ?' মেঝেতে ছড়ি ঠুকল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'আচ্ছা, আজ তা হলে আসি। কিশোর, এসো না একবার কাটিরঙ্গায়, তোমরা সবাই? অনেক কিছু দেখার আছে।'

'যাব, নিশ্চয়ই যাব!' হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুসার মুখে। 'ইনডিয়া দেখার শখ আমার অনেক দিনের।'

'সুযোগ করতে পারলে আমিও যাব,' কিশোর বলল। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে তার চোখ। 'আমার নিজের দেশকে দেখব না! এই বিদেশ বিভূঁয়ে পড়ে আছি বটে, কিন্তু দেশ তো আমার ওই উপমহাদেশেই–বাংলাদেশে!'

'যেও। হ্যাঁ, ঠিকানা তো তোমার কাছে আছেই। শুধু একটা চিঠি লিখে দিয়ো আমার কাছে। ব্যস, আর কোন চিন্তা করতে হবে না তোমাদেরকে। তোমাদের জন্যেই দেবতাকে আবার ফিরে পেয়েছি। অনেক, অনেক ধন্যবাদ। চলি।'

'আরে, আরে, যাচ্ছেন কোথায়? বসুন,' লাফিয়ে উঠল কিশোর।'একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম! আমাদের বাড়িতে এসে খালিমুখে ফিরে যাবেন? সকালে চাচী শুনলে আমাকে আস্ত রাখবে? অন্তত এক কাপ চা তো খেয়ে যান।'

হেসে আবার বসে পড়ল পুরোহিত। 'দাও। বুড়ো মানুষ তো, চা-ই বেশি খাই।'

***